মুক্তি-যুদ্ধে বাঙালী

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

মূল্য ২৲ টাকা

সূচী

মুক্তি-যুদ্ধে বাঙালী

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

মূল্য ২৲ টাকা

নন্দীপাড়া, চুঁচুড়া (হুগলী)
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৫৭

মুদ্রাকর
শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
১, কর্নওআলিস স্ট্রীট্
কলিকাতা

মুখবন্ধ

সারা ভারত গ্রাস করবার আগে ইংরাজ এই বাংলা দেশেই শেকড় চালিয়েছিল খুব শক্ত ক'রে। এই বাংলা দেশই বন্দিনী মাতৃভূমির মুক্তির সন্ধান করেছে ভারতের সকল প্রদেশের ঢের আগে। সারা ভারতের ঘুম ভাঙিয়েছে বাংলা নব নব চিন্তাধারার প্রবর্তন ক'রে, ভারতের নবযুগের সৃষ্টিও করেছে এই বাংলা। ভারতের অন্য সব প্রদেশ বরাবরই অনুসরণ করেছে এই বাংলাকে।

পলাশীর আমবাগানে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুনের সূর্যাস্তের পর বার বার বাংলা যে মুক্তি-প্রচেষ্টা করেছে, যুগে যুগে যে ভাব-বিপ্লব ও কর্ম-বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তার কাহিনীই ভারতের মুক্তি-যুদ্ধের কাহিনী। গোটা উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীরও প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলাই একটানা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে সারা ভারতের। "মুক্তি-যুদ্ধে বাঙালী'তে পলাশীর পর থেকে শুরু ক'রে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাঙালীর মুক্তি-যুদ্ধের কাহিনীই দেওয়া হয়েছে অতি সোজা ভাষায় ও অতি সংক্ষেপে, মুখ্যত বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য।

বলা বাহুল্য যে, এতে সাহায্য পেয়েছি বাংলায় প্রচলিত বহু পরিচিত পুস্তক, পত্র ও পত্রিকা থেকে। এ ঋণ যেমন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তেমনি অকুণ্ঠ চিত্তে এ ত্রুটিও স্বীকার করি যে, বহু শহীদ, বহু সর্বস্বত্যাগী দেশকর্মীর কথা হয়তো বাদ প'ড়ে গেছে। এই ত্রুটি সংশোধনের বিশেষ ইচ্ছা রইল।

তাদের ভুলো না

মুক্তির সন্ধান লাগি যুগ যুগ অসাধ্য সাধনা
যারা করে গেল, যারা বিপক্ষের সহস্র আঘাতে
জর্জরিত দেহ-মন, দীর্ণ-আশা, তবু একমনা
আদর্শনিষ্ঠায় নিল মৃত্যুবাণ তুলে নিজ হাতে,
তারাই তো রেখে গেল দেশপ্লাবী আলোর ইংগিত,
তারাই তো গেঁথেছিল এ বিরাট চেতনার ভিত,
বিক্ষিপ্ত জীবনগুলি অন্ধকারে হ'ল অবসিত,
প্রত্যূষের নিমন্ত্রণ স্বর্ণলিপি পাঠাল না রাতে—
অগোচরে উপেক্ষিত, হে প্রভাত তাদের ভুলো না,
আদর্শ নিষ্ঠায় যারা মৃত্যুবাণ তুলে নিল হাতে।

শস্যের জেগেছে আশা ক্ষেত্র দেখে হবে নাকি মনে,
কাদের জীবন দিয়ে চষা হ'ল ভূমি অনুর্বর,
প্রাণের সংগীতে-ভরা লোকালয় ছাড়ি এক কোণে
গৃহহীন বন্ধুহীন খোঁড়ে মাটি কঠিন উষর।
কাদের শোণিতে সিক্ত দীর্ঘ দিনে সেই মৃত্তিকায়,
শ্যামল প্রাণের আশা বীজ ফুঁড়ে আজ দেখা যায়,
ভবিষ্য আলোর লাগি বন্ধ কারা আঁধার কারায়,
গৃহহীনে গৃহ দিতে পথে পথে বেঁধেছে যে ঘর,
মনে ক'রো দ্বারপথে নবগৃহ-প্রবেশের ক্ষণে
কাদের জীবন দিয়ে চষা হ'ল ভূমি অনুর্বর।

বন্ধুর কঠিন পথ পার হ'য়ে মরুভূ প্রান্তর
যাত্রী যারা চলেছিল সাথে নিয়ে দুর্যোগ প্রলয়,
রক্তাক্ত ললাটে ঝলে প্রতিজ্ঞার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর
কালের আড়ালে তারা—তবু আজ হ'ল অভ্যুদয়
নূতন প্রভাত-সূর্য, তারাই তো ভেঙেছে আগল,
রুদ্ধ কপাটের ফাঁকে উষালোকে করে ঝলমল
তাদের প্রাণের আলো, আজীবন ধ্যান-অচঞ্চল,
মরণ যাদের হ'ল কালস্রোতে নব-জন্মময়,
গৃহহীনে গৃহ দিতে পথে পথে বেঁধেছে যে ঘর—
উৎসব-প্রাংগণে আজ বল বল, 'জয় তার জয়'।

—সন্ধ্যা ভাদুড়ী

সূচী

Sri Aurobindo

পটভূমিকা

ইংরাজ ভারতে আসে দোকানের বেসাতি মাথায় নিয়ে। বেশ ভাল ক'রে পসার জমায় মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে। আসে দলে দলে ইংরাজ পাদ্রী ক্রস্ বুকে ঝুলিয়ে। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তারা প্রচার করে যীশুর প্রেমের বাণী। এই ইংরাজ পাদ্রী আর ইংরাজ দোকানদার চারদিকে শেকড় চালিয়ে দেয় বাংলার মাটিতে। বাংলার মায়া সে আর কাটাতে পারে না, ব'সে ব'সে ভাবে এই মাটির মালিক সে হ'তে পারে কিনা। কোম্পানীর ব্যবসা আর কোম্পানীর কর্মচারীদের রক্ষার অজুহাতে সে সংগ্রহ করে সেপাই আর তৈরি করে কেল্লা। তারপর সে চেষ্টা করে দেশের মাতব্বরদের লোভ দেখিয়ে হাত করতে।

নবাব আলিবর্দী খাঁ বুঝতে পারেন ইংরাজের অভিসন্ধি। তাই অন্তিম শয্যায় শায়িত বৃদ্ধ আলিবর্দী অত্যন্ত উদ্বেগ ভরে সিরাজকে বলেন,—দাদু, তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু ইংরাজ বণিক, সব চেয়ে তোমার বেশি ভয়ের কারণ ওরাই। ওদের বিশ্বাস ক'রো না ভাই।

বৃদ্ধের অন্তিম কথা সফল হয় তার মৃত্যুর পরেই। ধূর্ত ক্লাইব আসেন বাংলা দেশে। হীন স্বার্থে অন্ধ বাংলার

একদল বিশ্বাসঘাতক মাতব্বর লোক চক্রান্ত করে তাঁর সংগে। বিশ্বাসঘাতক চূড়ামণি মীরজাফর তাঁর সংগে যোগ দেয় নবাবীর লোভে। পলাশীতে হয় যুদ্ধের অভিনয়। অসহায় সিরাজ বাংলা দেশ রক্ষা করবার জন্য পায়ে ধরেন মীরজাফরের। কোরাণ হাতে ক'রে বিশ্বাসঘাতক আশ্বাস দেয় সিরাজকে; পরক্ষণেই ক্লাইবকে সাহায্য ক'রে বলি দেয় বাংলার স্বাধীনতা। বাঙালী মীরমদন প্রাণ দেন বীর-বিক্রমে ইংরাজের সংগে যুদ্ধ ক'রে। তারপর বাঙালী বীর মোহনলাল একলা যে বীরত্ব দেখান তাতেই ইংরাজের চক্ষুস্থির হয়, ক্লাইবের বুকে শুরু হ'য়ে যায় কাঁপুনি।

আর একটু কাল মাত্র, কিছুক্ষণ যুদ্ধ চললেই ইংরাজের পরাজয় নিশ্চিত। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাড়াতাড়ি ক্লাইবকে আশ্বাস দিয়ে সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দেয়। নিতান্ত অনিচ্ছায় মোহনলাল বাধ্য হন সেনাপতির আদেশ মানতে।

এবার ক্লাইব আক্রমণ করেন; কিন্তু মীরজাফরের অধীনে ৩৫,০০০ সৈন্য নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মতো। এমনি ক'রেই বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য ডুবে যায় গংগার তীরে পলাশীর আমবাগানে।

মাত্র দুই শত অশ্বারোহী নিয়ে নিজে হাতীর পিঠে চেপে সিরাজ পলাশী থেকে ছুটে যান মুরশিদাবাদে। যদি কোন রকমে রাজধানী রক্ষা করা যায়!

টাকা দিয়ে লোক সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে চাইলেন সিরাজ; আর এই জন্যই তিনি খুলে দিলেন রাজকোষ। দু'হাতে বিলিয়ে দিতে লাগলেন টাকা।

টাকা নাও, তরোয়াল ধর আর রক্ষা কর মুরশিদাবাদ।

রাজকোষ যায় ফাঁকা হ'য়ে, ভীড়ও যায় পাতলা হ'য়ে।

কে রক্ষা করবে দেশ? কেউ নেই। টাকা নিয়ে সবাই স'রে পড়ল।

আর কোন উপায় নেই দেখে সিরাজ পালাতে বাধ্য হলেন নৌকোয় ক'রে। কোন রকমে বাংলা পার হ'য়ে মঁসিয়ে লার কাছে যেতে পারলেই তাঁর সৈন্যদের নিয়ে তিনি পাটনায় গিয়ে রামনারায়ণের সৈন্যদের সংগে যোগ দিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন,—এই ছিল সিরাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিধাতা অন্য বিধান ক'রে রেখেছেন তখন।

রাজমহলের কাছে সিরাজের নৌকো গেল আটকে নদীর স্রোত তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ ব'লে। আর যাওয়ার উপায় নেই। কাছেই একটি মস্‌জেদ। সপরিবারে এইখানেই অতিথি হবার ইচ্ছা হয় তাঁর। মস্‌জেদের লোকদের সন্দেহ হয় তাঁর ওপর।

কাছেই ছিলেন মীর দাউদ আর মীরকাশিম সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। মস্‌জেদের লোকেরা তাড়াতাড়ি গিয়ে খবর দেয় তাঁদের। সিরাজ বন্দী হন সপরিবারে। তাঁর নিজের রাজধানীতে নিজের প্রাসাদেই নিয়ে আসা হয় চোর-ডাকাতের

মতো শিকল পরিয়ে। তারপর ক্লাইব আর মীরজাফর পরামর্শ ক'রে তাঁকে দেন মৃত্যুদণ্ড। রাত্তিরের গাঢ় অন্ধকারে তাঁরই অন্নে এবং তাঁরই মায়ের স্নেহে প্রতিপালিত নরপশু মহম্মদী বেগ এগিয়ে যায় তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে। নিজের দেশ রক্ষা করার চেষ্টার অপরাধে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার দেহ হ'য়ে পড়ে খণ্ড খণ্ড। তারপর দিন সেই খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহ হাতীর পিঠে চাপিয়ে শোভাযাত্রা করা হয় মুরশিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায়। এই চরম পাশবিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও সকল রকমের পৈশাচিকতার মধ্য দিয়েই শুরু হয় বাংলায় ইংরাজ-রাজত্ব।

এবার ইংরাজ কোম্পানীই হ'ল বাংলার ভাগ্যবিধাতা। কোম্পানীর সর্বগ্রাসী লোলুপ দৃষ্টি পড়ে না এমন একটি গাঁ নেই বাংলা দেশে। অজগর যেমন ক'রে জড়িয়ে ধরে তার শিকার, কোম্পানীও ঠিক তেমনি ক'রে জড়িয়ে ধরে সারা বাংলাকে, আর লুব্ধ হিংস্র দৃষ্টি হানে সারা ভারতের দিকে। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য হ'য়ে যায় অচল, সবই চ'লে যায় কোম্পানীর হাতে। দেশে ওঠে হাহাকার। সোনার বাংলার ঘরে ঘরে দেখা দেয় দারিদ্র্যের করাল ছায়া।

মীরকাশিম হাড়ে হাড়ে বোঝেন যে, ইংরাজ বণিককে যে কোন রকমেই হোক যুদ্ধ ক'রে হারাতে না পারলে বাংলার রক্ষা নেই কিছুতেই। সবল কখনো ন্যায় ও যুক্তির ধার ধারে না। সে যুক্তি চালায় তার নিজের সুবিধা মতো।

দুর্বলের দুর্দশায় সবলের সুনিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। মীরজাফর ইংরাজের হাতের পুতুল, দেশের লোকে তাকে বলে ক্লাইবের গাধা। অতএব যে কোন রকমেই হোক মীরজাফরকে তাড়িয়ে বাংলার শাসন-ক্ষমতা নেওয়া চাই নিজের হাতে।

এদিকে কোম্পানী মীরজাফরকে এমন ভাবে শোষণ ক'রে রেখেছে যে, আর তার কাছে বিশেষ কিছু পাওয়ার আশা নেই। এই সুযোগে কূট কৌশলে মনস্তুষ্টি ক'রে কোম্পানীকে হাত ক'রে, মীরকাশিম জোর ক'রে মীর-জাফরকে তাড়ালেন তার রাজপ্রাসাদ থেকে এবং নিজে গ্রহণ করলেন বাংলার শাসন-দণ্ড।

এর পরই তাঁর শুরু হ'ল ইংরাজের সংগে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এতদিন যে রাজপ্রাসাদে হরদম চলত নাচ, গান, হল্লা, আর নানা রকমের বিলাস, তার সবই বন্ধ হ'ল এক দিনে। তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন সব রকমের অপব্যয়। ইংরাজ-বণিককে তাড়িয়ে বাংলাদেশ রক্ষা করবার জন্য সর্বস্ব পণ করেন তিনি। কিন্তু ইংরাজের চোখের সামনে থেকে তো আর গোপন প্রস্তুতি চলে না, দূরে যাওয়া দরকার। তাই তিনি রাজধানী সরিয়ে নিলেন মুরশিদাবাদ থেকে মুংগেরে। সেখানে তাঁর বাঙালী বাহিনী দুর্ধর্ষ হ'য়ে ওঠে ইউরোপীয় কায়দায় যুদ্ধ শিক্ষা ক'রে।

পুরাণো রাজধানী মুরশিদাবাদে থেকেই ইংরাজেরা টের

পায় মুংগেরে মীরকাশিমের গোপন প্রস্তুতি। সুচতুর কোম্পানীর তখন একমাত্র কাজ হ'ল বাংলার বিশ্বাসঘাতকের দলকে হাত ক'রে কাজে লাগানো। মীরকাশিমকে তারা মনে করেছিল আর একটি মীরজাফর, কিন্তু যখন তাদের ভুল ভাঙল, তখন স্বভাবতই বিষম রেগে গেল তাঁর ওপর।

ভাবনা কি, মীরজাফর তো আছে!

কোম্পানী আবার গেল মীরজাফরের কাছে, তাকে আবার এনে মসনদে বসায় আর তার পুরাতন বন্ধুদের এনে ব্যবস্থা করে মীরকাশিমের সংগে যুদ্ধের। কোম্পানীর সাহস যায় বেড়ে।

নিতান্ত অসহ্য হ'য়ে ওঠে কোম্পানীর ব্যবহার। পাটনা কুঠির এলিস্ সাহেবের ঔদ্ধত্য ছাড়িয়ে যায় সকল সীমা। যুদ্ধ হ'য়ে ওঠে অনিবার্য।

মীরকাশিম বাধ্য হলেন পাটনায় ইংরাজের রক্তপাত করতে। তাঁরই নেতৃত্বে বাঙালী সৈন্যবাহিনী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটোয়ায়, যুদ্ধ করে গিরিয়ায়, আর যুদ্ধ করে উধূয়ানালায়। সর্বত্রই মীরকাশিমের জয়ের সম্ভাবনা ষোল আনা থাকা সত্ত্বেও জয় হয় ইংরাজের; সর্বত্রই জয়ী হয় বিশ্বাসঘাতকতা, সর্বত্রই পুনরভিনয় হয় পলাশীর। নিজের স্বার্থের জন্য দশের ও দেশের স্বার্থ অনায়াসে বলি দেওয়ার মতো হীনতম প্রবৃত্তির লোকের কিছুমাত্র অভাব কোন দিনই ছিল না আমাদের দেশে। মীরকাশিম যে সব লোকের ওপর

নির্ভর করেছিলেন তাদের অনেকেই তাঁর ও বাংলাদেশের সর্বনাশও করেছে সকলের চেয়ে বেশি।

ইংরাজের সংগে তাঁর শেষ যুদ্ধ হয় বক্সারে। যুদ্ধের সময়ে দিল্লীর বাদশা মীরকাশিমকে ছেড়ে যোগ দেন ইংরাজের দলে, আর অযোধ্যার নবাব এখানে হঠাৎ হ'য়ে দাঁড়ান বাংলার মীরজাফর।

বিশ্বাসঘাতকতার মতো ভয়ংকর শত্রু আর নেই। মুক্তি-সাধকদের আত্মদান বারে বারে ব্যাহত ক'রে দিয়েছে এই ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতকতা।

বাংলাকে রক্ষা করবার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হ'য়ে গেল এমনি ক'রে।

বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম শহীদ মীরকাশিম হলেন দেশত্যাগী, তাঁর আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না কোন দিন। বাংলার শেষ আশার আলোটুকুও মিলিয়ে গেল নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ

ইংরাজ-বণিক শেকড় চালায় বাংলার সব জায়গায়। এই বাংলার গংগাতীরেই তার সাম্রাজ্যের পত্তন। আর এই গংগার তীর থেকেই সে বিস্তার করে তার লোলুপ রসনা সারা ভারতের দিকে।

১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন ইংরাজের পতাকা ওড়ে পলাশীর আমবাগানে। বিনা আয়াসে উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় তার আর আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু তার শান্তি বিশেষ ক'রে ভঙ্গ করেন মীরকাশিম। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে হ'ল তাঁর পতন। সুতরাং এবার আর ইংরাজকে পায় কে?

এবার শুরু হ'ল কোম্পানীর নির্মম শোষণ। বাংলার ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গেল; লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে বাংলার নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের বাণিজ্যেই হ'ল কোম্পানীর একচেটে অধিকার। সমৃদ্ধ বাংলা হ'য়ে ওঠে নিরন্ন, চাষীর বুক চিরে বেরোয় হাহাকার, জমিদারী চড়ে নীলামে, জমিদার পথে বসে। সকল দিক দিয়েই বাঙালীর শিরদাঁড়া যায় ভেঙে।

সাধারণ মানুষের তখন অন্যায়ের প্রতিরোধ করার শক্তি

না থাকলেও, বাংলাদেশে একদল সন্ন্যাসী সংঘবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ালেন ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

যাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসী হন, তাঁরা সাধারণতঃ লোকালয়ের কোন ব্যাপারের সংগেই কোন সম্পর্ক রাখেন না,—তা সে সামাজিক ব্যাপারই হোক বা রাজনৈতিক ব্যাপারই হোক। হয় বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থানে, না হয় লোকালয়ের দূরে কোন মঠে বা আশ্রমে ভগবানের চিন্তাতেই তাঁরা দিন কাটান। কিন্তু বাংলাদেশের একদল সন্ন্যাসী জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় উদাসীন থাকতে পারলেন না মোটেই। জনগণের কল্যাণই তাঁদের জীবনের আদর্শ। জনগণের অকল্যাণে উদাসীন থেকে ভগবানের উপাসনা চলে না, ধর্মসাধন হ'তে পারে না। এই সন্ন্যাসীরা সংঘবদ্ধ হলেন ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে।

তাঁরা স্থির করলেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ বিদেশীর অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ। বিদেশীর হাত থেকে এদের মুক্তি চাই আগে। এই বিদেশী ইংরাজ ধর্ম মানে না, যুক্তি মানে না। বিবেকের বালাই তার নেই। অতএব তাকে মেরে তাড়াতে হবে। জনগণের মধ্যেও চেতনা জাগানো চাই।

এই সন্ন্যাসীদের সংগে সংগে একদল মুসলমান ফকিরও সংঘবদ্ধ হলেন মজনু শার নেতৃত্বে। আর্ত মানুষকে রক্ষা না ক'রে, তাকে উপেক্ষা ক'রে শুধু খোদাকে ডাকলে ধর্ম হয় না,—এই সত্য তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন।

কাজেই অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে বিরাট সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সেই বিদ্রোহ শুধু হিন্দু সন্ন্যাসীদেরই নয়, মুসলমান ফকিরদেরও। সন্ন্যাসী ও ফকিররা একযোগে একই আদর্শ নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

হিন্দু সন্ন্যাসীরা নানা দিক থেকে এসে মিলিত হতেন এক একটা জায়গায় এক একটা বিশেষ ধর্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ঢাকা জেলায় লাঙলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা সমবেত হতেন এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতেন। বিশেষ তিথিতে ও বিশেষ দিনে প্রতি বছর গংগাসাগরে স্নান করতে গিয়ে, অথবা পুরীতে রথযাত্রায় গিয়ে সকলে মিলিত হতেন। নেংটিপরা অথবা গেরুয়াপরা সাধুর দল সব জায়গায়ই আদর-যত্ন, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন সকলের কাছে। খাওয়া-পরার ভাবনা এঁদের কোন দিন ছিল না; কি ধনী, কি দরিদ্র খুশী মতো যা দান করত, তাতেই যথেষ্ট হ'ত এঁদের। সুতরাং যারা এঁদের ভালবাসত এবং এঁরাও যাদের ভালবাসতেন তাদের জন্য অস্ত্র ধারণ করাই এঁরা সত্যিকার পুণ্যকর্ম, সত্যিকার ধর্ম ব'লে গ্রহণ করলেন।

মুসলমান ফকিরদেরও বিশেষ বিশেষ পুণ্যস্থান ও পুণ্য দিন ছিল। তাঁরা সেই সব দিনে সেই সব জায়গায় মিলিত হতেন। পাণ্ডুয়ার দরগা, মালদহের আদিনা দরগা, গারো পাহাড়ের শাহ-কামালের দরগাই ছিল ফকিরদের সমবেত

হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান। দেশের সর্বত্রই এঁদের প্রচুর সম্মান ছিল জনসাধারণের কাছে। নানা দরগায় মিলিত হ'য়ে পরামর্শ ক'রে এঁরা স্থির ক'রে নিতেন কার্যক্রম।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা অস্ত্র-সংগ্রহ ও অস্ত্র-শিক্ষায় বিশেষ ক'রে মন দিলেন। নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা ক'রে এঁরা হলেন খুব দুর্ধর্ষ লাঠি খেলোয়াড়, এঁদের বর্শা তীর-ধনুর সন্ধান হ'য়ে উঠল অব্যর্থ। বন্দুক ছুড়তে এঁরা হলেন বিশেষ পারদর্শী, আর তরোয়াল চালাতে অত্যন্ত নিপুণ। ঘোড়-সওয়ারদের মতো ঘোড়ায় চ'ড়ে জেলার পর জেলা যেতেন অতিক্রম ক'রে। গহনবনের মধ্য দিয়ে পাহাড়-পর্বতের পথহীন পথেও এঁদের গতিবিধি ছিল অবাধ।

ঋষি বংকিমচন্দ্র লাঠির মহিমা বর্ণনায় বলেছেন, লাঠিই ছিল তখন দণ্ড-মুণ্ডের বিধান কর্তা, লাঠিই ছিল পিনাল কোড্; তা বিশেষ ক'রে দেখা গেছে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের লাঠি চালনায়। ইংরাজের সেপাইদের বন্দুক এঁরা কেড়ে নিয়েছেন শুধু লাঠি চালিয়ে। কি কৌশলে লাঠি চালিয়ে বন্দুককেও ব্যর্থ ক'রে দেওয়া যায়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না এ যুগে।

এই নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক মুক্তি-সাধকদের সংগে বহু জায়গায় দেশের শোষিত ও বঞ্চিত কৃষক, মজুর প্রভৃতি যোগ দিয়েছে হাজারে হাজারে। ইংরাজরা এদের বলেছে ডাকাত। ইংরাজের অত্যাচারে যারা বাধা দিয়েছে তাদের ডাকাত বলা

ইংরাজের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরাজের ইতিহাস যা-ই বলুক না কেন, এই সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে একটানা চল্লিশ বছর ধ'রে,—১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।

একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকির সংঘবদ্ধ হ'য়ে জনগণের কল্যাণে অস্ত্র ধারণ ক'রে ঢাকা জেলার ভাওয়ালের জংগলে, জলপাইগুড়ি জেলায়, বগুড়া জেলায় কেল্লা তৈরি ক'রে, নানা জায়গার জংগলে ও পাহাড়ের মাথায় আত্মরক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ক'রে, একটা বিশাল ও সুদৃঢ় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। বাংলার মুক্তির ইতিহাস এঁরা ক'রে রেখেছেন গৌরবদীপ্ত।

নানা কেল্লা থেকে এঁরা চালিয়েছেন খণ্ড খণ্ড অভিযান, অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ করেছেন এবং ইংরাজকে বিব্রত ক'রে অনেক অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছেন। উত্তরবংগে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ;—পূর্বংগে ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল এবং তখনকার পশ্চিমবংগে যশোহর ছিল এঁদের কার্য-কলাপের বিশেষ ক্ষেত্র।

ইংরাজের সংগে এঁদের সংঘর্ষ খুব বেশি হয়েছে উত্তরবংগে। কুচবিহারের রাজার পক্ষে সন্ন্যাসীরা যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাতে বেগতিক দেখে ইংরাজ-সেনাপতি মরিসন্‌কে সসৈন্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। এর দু'তিন বছর পরেই

জলপাইগুড়িতে এক যুদ্ধে মাট্‌ল সাহেব প্রাণ হারান সন্ন্যাসীদের হাতে। এর পরেই কিথ্‌ সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রংপুরে গেলেন সন্ন্যাসীদের ধরবার জন্যে। ফলে তাঁকে আর ফিরে আসতে হ'ল না। তিনিও দলবল সহ প্রাণ দিলেন সন্ন্যাসীদের হাতে। এই রংপুরেই কিছুদিন পরে এক যুদ্ধে ক্যাপ্‌টেন্‌ টমাস্‌ নিহত হলেন সসৈন্যে। কিছুদিন পরেই আর এক যুদ্ধে প্রাণ দিলেন মেজর ডগ্‌লাস্‌ ও ক্যাপটেন্‌ এডোয়ার্ড।

মুসলমান ফকিররাও যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বাখরগঞ্জ আক্রমণ করেন এবং কোম্পানীর ঢাকার ফ্যাক্‌টরী দখল করেন। সাহেবরা পালিয়ে রক্ষা পান। এর আট বছর পরে ফেল্‌থ্যাম সাহেবের সংগে যুদ্ধ হয় ফকিরদের। এই যুদ্ধে ফকিররা অদম্য সাহসের পরিচয় দেন।

সন্ন্যাসীরা রামপুর-বোয়ালিয়ার ফ্যাক্‌টরী দখল করেন। বেটন সাহেব দলবল-সহ তাঁদের হাতে বন্দী ও নিহত হন।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা চেষ্টা করেছেন কোম্পানীর অত্যাচার ও অবিচার বন্ধ করতে। প্রাণপণ শক্তিতে তাঁরা আঘাত হেনেছেন ইংরাজকে। শেষ সাফল্য লাভ হোক্‌ বা না হোক্‌, আন্তরিক প্রয়াসের মূল্য সাফল্যের মূল্যের চেয়ে কম নয়।

এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় ঋষি বংকিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" সৃষ্টি ক'রে সাহিত্যে এই বিদ্রোহকে অমরত্ব দান করেছেন।

নন্দকুমারের ফাঁসি

কোম্পানীর শাসন ও শোষণের প্রথম অভিশাপরূপে দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

এর পূর্বে বাংলাদেশে খাদ্যের প্রাচুর্য লোপ পেত শুধু অনাবৃষ্টির ফলে ফসল না হওয়ায়, কিংবা অতিবৃষ্টির ফলে ফসল নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায়। বাংলাদেশের লোক এই প্রথম জানলে যে, বিশেষ বিশেষ লোক অপরিমিত ধনলোভে অন্ধ হ'য়ে দুর্ভিক্ষ ঘটাতে পারে। বাংলাদেশে এক বছরে যে ধান জন্মাত, তাতে বাঙালীর খাওয়া চলত তিন বছর।

অর্থ-পিশাচ মহম্মদ রেজা খাঁ দেখলে, দু'বছর দেশে অজন্মা হওয়ায় চালের দাম গেছে ভয়ানক বেড়ে। বাংলার সর্বত্র উঠেছে হাহাকার। কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারী এবং কয়েকজন হৃদয়হীন পশুর মতো হীন দেশীয় লোকের সহায়তায় রেজা খাঁ বাংলাদেশের সব ধান কিনে গোলাবন্দী ক'রে রেখে দেয়।

এদিকে অসংখ্য মানুষ মরে তিলে তিলে বাংলার গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে। আরো বেশি টাকার আশায় রেজা খাঁ গুদামগুলি খুলে দিলে না তখনও। ফলে এই সুজলা সুফলা বাংলার তিন কোটি লোকের মধ্যে এক কোটিই মারা গেল শুধু এক মুঠো ভাতের অভাবে। কলকাতা শহর ঢেকে গেল অগণিত গলিত শবে।

ঋষি বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' শুরু হয়েছে এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র দিয়েই।

এতো মানুষকে তিলে তিলে মেরে যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিল রেজা খাঁ, তার একটা মোটা ভাগ যে কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারী পেয়েছিল, তাদের মধ্যে চরিত্রহীন মনুষ্যত্বহীন ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ই ছিল প্রধান।

সোনার বাংলা হ'য়ে গেল শ্মশান। কিন্তু এতেও কোম্পানীর কর আদায় বন্ধ রইল না। প্রেমিক যীশুখৃষ্টের নামের ধ্বজা বহন ক'রে সীমাহীন নিষ্ঠুরতার এমন বর্বর নিদর্শন একমাত্র ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীরাই দেখাতে পেরেছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বিলেতে লিখে জানালে যে, যারা তখনও মরেনি তাদের কাছ থেকেও জোর ক'রে কর আদায় করা হয়েছে, নইলে অংকের পরিমাণ সমান থাকে না।

কাছে ও দূরে চলে তার ষড়যন্ত্র ঐশ্বর্য লুট ও রাজ্য জয় করবার। এই নীচাশয় ধূর্ত জালিয়াত ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ই বাংলা-দেশের গভর্ণর নিযুক্ত হয় ১৭৭২ সালে, আর এক বছর পরেই হয় সারা ভারতের গভর্ণর জেনারেল।

তার সব রকম অপকর্মের—মিথ্যা, প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ, জালিয়াতি ও অত্যাচারের প্রধান সহায় ছিল আমাদের দেশেরই হীনচরিত্রের কয়েকজন লোক,—মোহনপ্রসাদ, রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গংগাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার প্রভৃতি। বিশ্বাস-

ঘাতক বাঙালীদের সাহায্যেই তো ইংরাজ শিরদাঁড়া ভাঙতে পেরেছে বাঙালীর।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে খুব ভাল ক'রে চিনেছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তিনিই চেষ্টা করেছিলেন রেজা খাঁকে দিয়ে চালের গোলা খুলে দিতে। রেজা খাঁর অমানুষিক ব্যবহারে নন্দকুমার অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, কিন্তু কি করবেন তিনি একলা?

রেজা খাঁ ও সিতাব রায় রাজস্ব আদায় করতেন। দেখা গেল, এক রেজা খাঁই কোম্পানীর বহু লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। আগাগোড়া হিসাব পরীক্ষা ক'রে এই চুরির অংক বার করার মতো ক্ষমতা একমাত্র নন্দকুমারেরই আছে, এটা খুব ভাল ক'রেই জানত ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্, কাজেই বাধ্য হ'য়ে হিসাব পরীক্ষার ভার দিলে নন্দকুমারের ওপর।

নন্দকুমার হিসাব পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, রেজা খাঁ অন্যূন তিন কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

বেগতিক দেখে রেজা খাঁ ঘুষের প্রস্তাব করে,—ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে ১১ লক্ষ টাকা ও নন্দকুমারকে ২ লক্ষ টাকা।

এ প্রস্তাব খুব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান ক'রে নন্দকুমার হিসাব পরীক্ষার পূর্ণ বিবরণ দেন ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, রেজা খাঁ বেশ সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তেই আছে। ১১ লক্ষেরও অনেক বেশি টাকা

ঘুষ দিয়ে রেজা খাঁ বশ করেছে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে এবং বেশ সদ্‌ভাবও জমিয়ে তুলেছে তার সংগে।

মুরশিদাবাদের নাবালক নবাব সুজাউদ্দৌলার মা ছিলেন নবাবের অভিভাবিকা। মণি বেগমের কাছে আড়াই লক্ষ টাকা, ৫৩৯২টি মোহর ও ৫৭০টি আধুলি ঘুষ নিয়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ নবাবের মাকে অভিভাবিকার পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মণি বেগমকে হঠাৎ ক'রে দিলে অভিভাবিকা। মোটা ঘুষ দিয়ে এই বড়লাটটিকে দিয়ে করানো যেত না এমন কোন অপকর্মই নেই। এই ঘুষের টাকা হেষ্টিংসের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল নন্দকুমারের গোমস্তা চৈতন্যনাথ, হেষ্টিংসের ভৃত্য জগন্নাথ এবং হেষ্টিংসের একান্ত অনুগত কান্ত পোদ্দারের ছেলে লোকনাথ।

সকলের পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর বাহেরবন্দ পরগণার জমিদারী জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ তার নিতান্ত আজ্ঞাবহ কান্ত পোদ্দারের ছেলে লোকনাথকে দেয়। এতেও হেষ্টিংসের প্রচুর টাকা পাওয়ার আশা ছিল।

মহারাজ নন্দকুমার তখন ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কার্যকুশলতা ও লোকপ্রিয়তার জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে দিল্লীর বাদশা তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ একটি অতি মূল্যবান পাল্কী পাঠিয়ে দেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের আর একটি বিশেষ আজ্ঞাবহ ভৃত্য সিতাব রায় জোর ক'রে এই পাল্কীটি পাটনায় আটক করে।

খবর এল নন্দকুমারের কাছে। বাদশা যে বস্তু খুশী হ'য়ে

পাঠিয়েছেন সে বস্তু সিতাব রায় আটক করে কি ক'রে? নন্দকুমারের প্রতি ঈর্ষা আর হেষ্টিংসের প্রতি তার অসীম ভক্তিই হ'ল এর মূল। নন্দকুমার এর প্রতিকারের জন্য হেষ্টিংস্‌কে জানালেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এর খুব চমৎকার বিচার করেছিল। পাটনা থেকে পাল্কীটা আনিয়ে নন্দকুমারকে না দিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

বাংলার বাইরেকার কথা ছেড়ে দিলেও শুধু বাংলাদেশেই তার অপকর্মের কাহিনীতে একটা মহাভারত তৈরি হ'তে পারে।

বহু বাঙালী তার সমস্ত অপকর্মের সহচর হ'য়ে নিজেরা হ'য়ে উঠেছে কুবের। কে আর তার বিরুদ্ধে কথা কয়? সাধারণ লোকেরা এই নিয়ে নিজেরা চুপি চুপি অনেক কিছু বলে, কিন্তু ভয়ে থাকে জড়সড় হ'য়ে। জাতের মেরুদণ্ড তখন গেছে ভেঙে। এই জাতির মধ্যে পুরুষ-সিংহ নন্দকুমার ভারতের বড়লাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালেন। বড়লাটের কাউন্‌সিলে বড়লাটের সামনে মিথ্যা, প্রতারণা, উৎকোচ, অত্যাচার ও জালিয়াতির অভিযোগ তারই বিরুদ্ধে নিয়ে আসা সেই যুগের একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সেই যুগেই শুধু নয়, এই যুগেও ভারতের সর্বময় কর্তার মুখের সামনে তাকে জালিয়াত, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী বলবার মতো বুকের পাটা ক'জনের দেখা গেছে?

অভিযোগের অকাট্য প্রমাণ দিলেন তিনি। বড়লাটের

কাউন্‌সিলের চারজন ইংরাজ সভ্যের মধ্যে তিন জনই তাকে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করেন। কেবল মাত্র একজন হেষ্টিংস্‌কে অপরাধী ব'লে মনে করে না। এই একজন হেষ্টিংসেরই বিশেষ অনুগত এবং হেষ্টিংসের দ্বারাই বিশেষভাবে লাভবান বার্‌ওয়েল্‌ সাহেব।

ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু অভিযোগ যে মিথ্যা তা প্রমাণ করতে না পেরে বললে, "আমি কাউন্‌সিল মানি না।" অর্থাৎ সে যখন বড়লাট, তখন তার যা খুশী তাই করতে পারে।

এ দেশের সমস্ত লোক, এমন কি ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজরাও স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, সকল রকম দুর্নীতিতে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ পৃথিবীর রেকর্ড ভংগ করেছে।

কিন্তু হ'লে কি হয়, ভারতের ইংরাজ মহলে সোরগোল প'ড়ে গেল। নির্যাতনে মেরুদণ্ড ভাঙা বাঙালীরাও হ'য়ে ওঠে চঞ্চল। ইংরাজরা শুরু করে সলা পরামর্শ।

ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের বাড়ীতে গিয়ে জোটে আমাদের দেশের উচ্ছিষ্টলোভীর দল। তাড়াতাড়ি যায় মোহনপ্রসাদ, জোটে গিয়ে রাজবল্লভ, জোটে গংগাগোবিন্দ সিংহ, হাজির হয় কান্ত পোদ্দারের দল।

কি করা যায়? বড়লাটের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ করবার সাহস? এর প্রতিশোধ নেওয়া চাই-ই!

রাত্তিরে পরামর্শ ক'রে এরা স্থির করে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটা জাল দলিলের নালিশ করানো হবে কলকাতার সুপ্রিম -কোর্টে। কারণ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে শুধু হেষ্টিংসের বন্ধুই নয়, হেষ্টিংসের মতোই চরিত্রবান। সুতরাং তার কাছে নন্দকুমারের নামে একটা নালিশ করতে পারলেই সুবিধা মতো ফল পাওয়া যাবে।

হেষ্টিংসের প্রসাদভোগী মোহনপ্রসাদ এই পরামর্শ মতো এক মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করলে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে। কিন্তু দলিল যে নন্দকুমার জাল করেছেন এটা তো প্রমাণ করা চাই। কোন রকমেই তা প্রমাণ করা যাচ্ছে না, যদিও টাকার লোভে আর অনুগত ব্যক্তিদের চেষ্টায় তৈরি-করা সাক্ষী অনেক ছিল হেষ্টিংসের পক্ষে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ আর এলিজা ইম্পে একেবারে মাণিক-জোড়। ইম্পে ভরসা দেয় বন্ধুকে।

এদিকে হেষ্টিংস্ দোষী সাব্যস্ত হ'য়ে রইল কাউন্সিলে। নন্দকুমারের সে অভিযোগ থাকে চাপা প'ড়ে। কিন্তু তাড়া-তাড়ি ক'রে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মোহনপ্রসাদের মামলা শেষ ক'রে ফেলে এলিজা ইম্পে। সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা করলে ইম্পে,—নন্দকুমার অপরাধী, আর এই অপরাধের একমাত্র দণ্ড হচ্ছে—ফাঁসি।

সারা দেশ খবর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়।

একে তো অভিযোগের প্রমাণ নেই, প্রমাণ থাকলেও জাল করার অপরাধে ফাঁসি হয় কি ক'রে ? বহু ইংরাজও এই বিচার-প্রহসনের তীব্র নিন্দা করেছে স্পষ্ট ভাষায়।

নন্দকুমারকে শেষ করতে না পারলে হেষ্টিংসের শান্তি নেই, অতএব তাঁকে ধ'রে এনে ফাঁসি দেওয়াই চাই। এই বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করতেও দেওয়া হ'ল না। আইন-কানুন, যুক্তি-তর্ক, বিবেক-মনুষ্যত্ব, সবই ব্যর্থ হ'য়ে যায় ঘৃণিত স্বার্থের কাছে।

খিদিরপুরেরর কাছে তৈরি হয় ফাঁসির মঞ্চ।

এদিকে এই অদ্ভুত বিচারের জন্য পদলেহীর দল অভিনন্দন দেয় এলিজা ইম্পেকে।

অবিচার, অত্যাচারে ক্লিষ্ট বাঙালীর একমাত্র ভরসা নন্দ-কুমারের জন্য দেশে দেশে উঠে হাহাকার। ইংরাজের অবিচার, অত্যাচার রোধ করতে গিয়ে ইংরাজ-শাসনের প্রথম প্রহরে মহারাজ নন্দকুমারই হলেন প্রথম বলি।

১৭৭৫ সালের ৫ই অগষ্ট সারা কলকাতার অগণিত মানুষ নিতান্ত অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলে—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নন্দকুমার নির্ভীক হৃদয়ে উন্নত মস্তকে এগিয়ে গেলেন ফাঁসির মঞ্চের কাছে; মঞ্চে উঠে বীরপুরুষ মাথা এগিয়ে দিলেন ফাঁসির দড়িতে।

ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সত্য বলার এই তো পুরস্কার স্বদেশ-সেবকের। ইংরাজ রাজত্বের এই প্রথম শহীদ নন্দকুমারকে ভুলতে পারে কি বাঙালী জাতি ?

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের অসংখ্য কুকীর্তির কাহিনী ইংলণ্ডেও চাপা রইল না। মনীষী ও বাগ্মী এড্মাণ্ড্ বার্ক, সেরিডান্ প্রভৃতির চেষ্টায় ইংরাজের পার্লামেণ্ট হেষ্টিংস্‌কে অপরাধী সাব্যস্ত করলে, কিন্তু সাত বছর বিচারের পর তাকে অব্যাহতি দিলে।

নন্দকুমারের ফাঁসিতে সারা দেশ শিউরে ওঠে বটে, কিন্তু আবার ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমন্ত শিশু হঠাৎ মার খেয়ে চেঁচিয়ে উঠে আবার যেমনি ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ক'রে।

এর পর দেখা গেল যে, ১৭৭৭ সাল থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে এ দেশ থেকে বিলেতে চলে গেছে এক হাজার পঁচাশি কোটি টাকা। দিনের পর দিন এই শোষণের টান আরো বেশি বাড়তে থাকে। কিন্তু তখনও জাত ঘুমে অচেতন।

মুক্তির অগ্রদূত

জাতির ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেন রাজা রামমোহন রায়। স্বাধীন চিন্তার শক্তি জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম সঞ্চার করেন তিনিই।

আমাদের সমাজের মধ্যে জাতিতে জাতিতে যে বৈষম্য ছিল, যে সব অমানুষিক প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সব সামাজিক অবিচার ও নির্যাতন ছিল, তা যে সম্পূর্ণ বিবেক-বিরোধী, ধর্মবিরোধী, এই বোধ রামমোহনই জাতির মস্তিষ্কে প্রবেশ করান নিজেই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে। তিনি ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী।

রামমোহনের বিদ্রোহই স্বাধীন চিন্তা প্রবর্তন ক'রে সৃষ্টি করে বাংলার তথা ভারতের নবযুগ। স্বাধীন চিন্তা ও সেই চিন্তা অনুসারে কাজ করবার মতো দুর্জয় সাহস জাতির মধ্যে এনে দেয় বিদ্রোহ। সমাজের অবিচার, ধর্মের নামে অবিচারকে বিধি-লিপি ব'লে মেনে না নিয়ে সত্যিই অবিচার ব'লে, অধর্ম ব'লে মানুষ যখন তীব্র ভাবে অনুভব করতে পারে, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে যার চৈতন্য জাগ্রত হয়, রাষ্ট্রের অবিচার সম্বন্ধেও তখন সে উদাসীন থাকতে পারে না। সমাজ-চৈতন্য থেকে রাষ্ট্র-চৈতন্যও আসে। সমস্ত অন্যায়কে চুরমার ক'রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই যার জীবনের ব্রত, রাষ্ট্রের অন্যায়-অবিচারের প্রতি সমগ্র জাতির

দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে তিনি পারেন না। রামমোহন জাতির অগ্রগতির, জাতির কল্যাণের সকল পথই উন্মুক্ত ক'রে দেন।

তিনিই দেশে সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনিই সকল দিক দিয়ে ভারতে নব-জাগরণের সূচনা করেন। এই জন্যই বর্তমান ভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে তিনিই সকলের অগ্রগণ্য। এক কথায় নব্য ভারতের স্রষ্টা হিসাবে চির-বিদ্রোহী রামমোহনই সকলের চেয়ে বেশি গৌরবের অধিকারী।

"সম্বাদ কৌমুদী"তে তিনি ক্রমাগত প্রবন্ধ লেখেন। এর পর "মিরাৎ-উল্-আখবার" নামে ফার্সি পত্রিকা তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। এই দুইখানা পত্রিকাতেই তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশ সহ্য করবার জন্য তো কোম্পানীর সরকার শাসন-ব্যবস্থা চালায়নি এদেশে। অতএব এবার বেরিয়ে এলো আইনের নাগপাশ। কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা চলবে না তার ফর্দ তৈরি হ'ল। এই ফর্দ অনুসারে হলফ্ ক'রে কাগজ বার করবার আগে মালিক, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

এই আইন মেনে নেওয়ার অর্থই অপমান বরণ ক'রে

নেওয়া। যাতে নিজের ও জাতির অমর্যাদা হয় তা কি আর রামমোহনের মতো মানুষ করতে পারেন ?

তাঁর মর্যাদাজ্ঞান যে কত তীক্ষ্ণ ছিল, একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিংক একবার বিশেষ প্রয়োজনে রামমোহনকে তাঁর কাছে আসতে অনুরোধ ক'রে একটি চিঠি লিখে নিজের এডিকংকে পাঠান। রামমোহন সংগে সংগেই সেই এডিকংএর মারফতে উত্তর দেন,—"যদি বড়লাটের প্রয়োজন থাকে তিনিই আসুন আমার কাছে, আমি তাঁর কাছে যেতে প্রস্তুত নই।"

এই তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদা বোধ যাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তিনি কি সরকারের অনুমতি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন ? কাজেই এই আইনের প্রতিবাদেই তিনি বন্ধ ক'রে দেন "মিরাৎ-উল্-আখবার"এর প্রকাশ এবং আন্দোলন শুরু করেন এই আইনের বিরুদ্ধে, আর বহু বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষর সহ প্রতিবাদ-পত্র পাঠান বিলাতে রাজার কাছে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় কোম্পানী আইন ক'রে জাতিগত বৈষম্য সৃষ্টি করে, সে আইনের বিধানই হ'ল এই,—হিন্দু ও মুসলমান জুরীরা কোনও খৃষ্টানের বিচারে জুরি হিসাবে নিযুক্ত হ'তে পারবে না।

রামমোহনই তখন ইংরাজকে জানিয়েছিলেন—যত বিলম্বেই

হোক্, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা একযোগে ইংরাজের অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে লড়বে এবং নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে। তখন ভারত তার বিরাট জনবল ও ধনবল নিয়ে ইংরাজের মিত্র হ'য়েও থাকতে পারে, আবার শত্রু হ'য়েও তার ভীষণ ক্ষতি করতে পারে।*

ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা রামমোহনের ভবিষ্যদ্-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লেই কি প্রমাণিত হয়নি?

দিল্লীর বাদশা তাঁকে সম্মানিত করলেন রাজা উপাধি দিয়ে। রাজা রামমোহনই বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলেতে গেলেন ১৮৩০ সালে। বিলেতে গিয়ে তিনিই প্রথম ইংরাজদের বুঝিয়ে দেন,—নিজেদের ভালমন্দ ভাববার এবং ইচ্ছা মতো কাজ করবার পূর্ণ ক্ষমতা ভারতবাসীর আছে।

সকল দিক দিয়েই রাজা রামমোহন ভারতের মুক্তি সাধনার অগ্রদূত।

---

* শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-প্রণীত "মুক্তির সন্ধানে ভারত"।

নীলের অভিশাপ

বাংলাদেশ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায় নীলকর সাহেবদের বর্বর অত্যাচারে।

একদিকে কোম্পানীর অবিচার, অত্যাচার ও শোষণ, আর একদিকে নীলের অভিশাপে বাঙালীর জীবন হয়ে ওঠে দুঃসহ। বাংলার চাষী হ'য়ে পড়ে প্রকৃতপক্ষে নীলকর সাহেবদের ক্রীতদাস।

নীলকর সাহেবের ইচ্ছায় এবং দেশীয় গোমস্তাদের নিদারুণ নিষ্ঠুর উৎপীড়নে চাষীদের বুকফাটা আর্তনাদ ওঠে। দাদন নিতেই হবে এবং যার যত ভাল ভাল ধানের জমি আছে সব জমিতেই নীলের চাষ করতেই হবে, এই হ'ল চুক্তি। দাদনের পুরো টাকা তো চাষীরা পেতোই না, উল্টে নীলের উৎপাদন মনের মতো না হ'লে নীলের দামটাও তাদের দেওয়া হ'ত না। তা ছাড়া কথায় কথায় কয়েদ রাখা হ'ত, খুঁটির সংগে দড়ি দিয়ে বেঁধে চাবুক মেরে সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত ক'রে অজ্ঞান ক'রে ফেলা হ'ত চাষীকে।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল এই। ভাল কোন ক্ষেতে ধান জন্মাবার উপায় নেই, চাষীর ঘরে নেই খাদ্য, নীলের চাষ ক'রে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও টাকা পায় না, পায় চাবুক আর হিংস্র-পশুর মতো বর্বর সাহেবদের শক্ত বুটের প্রচণ্ড লাথি। সপরিবারে

ধ্বংস হ'য়ে যায় বাংলার চাষী। যশোহর, নদীয়া, পাবনা জেলাতেই নীলের চাষ হ'ত সব চেয়ে বেশি। বিশেষ ক'রে এই সব জেলার কৃষককুল ছারখার হ'য়ে যায়।

প্রতিকার ছিল না এর। পদস্থ, গণ্যমান্য বহু বাঙালীই এই একটানা অমানুষিক অত্যাচার দেখেও নীরব থাকে অর্থে ও স্বার্থে অভিভূত হ'য়ে। কে শোনে এই দরিদ্র কৃষকের হাহাকার? দরিদ্ররা অক্ষম, ধনীরা ধনবৃদ্ধির চিন্তায় আত্মহারা।

এই সময়ে এক দরিদ্রের সন্তান নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন খুব জোরালো ভাষায়। ইনি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দরিদ্র ব'লেই বাল্যকালে তিনি বিশেষ লেখাপড়া করতে পারেন নি বটে, কিন্তু অদ্ভূত ছিল তাঁর প্রতিভা, অসাধারণ ছিল তাঁর দরদ অত্যাচারিত দরিদ্র দেশবাসীর ওপরে। নিজের চেষ্টাতেই ইংরাজী ভাষা তিনি এমনি আয়ত্ত করেছিলেন যে, ইংরাজী বলায় ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখায় তিনি হলেন বাঙালীদের মধ্যে অদ্বিতীয়। নীলচাষীদের হ'য়ে লেখনী ধারণ করার ফলে নীলকর সাহেবদের বিশেষ ভয়ের কারণ হয়েছিলেন তিনি।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ য়্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৃটিশ পার্লা-মেণ্টের কাছে যে আবেদন-পত্র পাঠানো হয়েছিল, তা রচনা করবার ভার দেওয়া হয়েছিল এই হরিশ্চন্দ্রকেই—য়্যাসোসিয়েশনে

বড় বড় নামজাদা ইংরাজীনবীশ থাকতেও। এই আবেদন-পত্রে ভারতের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যে-সব দাবী তিনি করেছিলেন, সেই সব দাবী পরবর্তী যুগে কংগ্রেস্‌কেও করতে হয়েছে বহুদিন।

ভাল ভাল জমি দাদন দিয়ে আটকে রাখা, পুরুষানুক্রমে জমিতে নীলের চাষ করতে বাধ্য করানো, নীলকরদের মতে চুক্তিভংগ হ'লে চাষীকে কয়েদ রেখে মারপিট করা, তাকে দিয়ে বেগার খাটানো ইত্যাদি অকথ্য রকমের অত্যাচার তখন চলেছিল অবাধে ; কিন্তু কোম্পানীর এমনই মজার আইন যে, মফস্বলের কোন ফৌজদারী আদালতে ইংরাজের বিচার হ'তে পারত না। ইংরাজের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলত শুধু কলকাতার সুপ্রীম্ কোর্টে। কথায় কথায় গরীব চাষীদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ করাও ছিল অসম্ভব। ধনীর পক্ষেই কি বারে বারে কলকাতায় গিয়ে বহু টাকা খরচ ক'রে নালিশ করা সম্ভব ? তাও আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে। আর ইংরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের কাছে সুবিচার পাওয়ার আশা করাও ছিল বৃথা। ইংরাজের কাছে এ দেশের লোকের জীবনের দামই বা কি ছিল ?

ধৈর্যের বাঁধ যখন একেবারে ভেঙে যায়, তখন আসে বিদ্রোহ। অত্যাচারই পথ ক'রে নিয়ে আসে বিদ্রোহকে। এবার কৃষকদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন যশোহর

জেলার চৌগাছা গ্রামের অদ্ভুত শক্তিমান দুইজন বিরাট পুরুষ—বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস।

প্রায় এক শো বছর আগে তো। তখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াতের সুবিধা আজকালকার মতো ছিল না। খবরের কাগজের মারফত প্রচারকার্য চালাবার কোন সুবিধাই ছিল না। তখন কোথায় বা ছিল এত খবরের কাগজের ছড়াছড়ি? তা ছাড়া তখন তো দেশের জনসাধারণ লেখাপড়া বিশেষ জানতই না, পল্লীগ্রামের লোকজনদের কাছে দুনিয়ার খবর যেতও না, আর তারাও সেজন্য কখনও মাথা ঘামাত না। চাষীরা ছিল সব নিরক্ষর; দেশাত্মবোধ আজকাল যেমন ব্যাপক, তখন তা মোটেই ছিল না। একটা বিশেষ গুণ ছিল এইসব নিরক্ষর চাষীদেরও। তারা ছিল অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সৎ। সব কাজেই তাদের আন্তরিকতা ছিল।

এই অবস্থার মধ্যে সারা যশোর, নদীয়া আর পাবনা জেলায় লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর, নির্যাতিত, নিঃসম্বল চাষীদের মধ্যে অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রবল স্পৃহা জাগিয়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর। তাঁদের নেতৃত্বে সেই যুগের পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্মঘট করল।

এত বড় সংঘবদ্ধতা, এত বড় ধর্মঘট, বিশেষ ক'রে কৃষক ধর্মঘট আজ অবধি ভারতের কোথাও হয় নি। সেই যুগের পঞ্চাশ লক্ষ কৃষকের এই দৃঢ়চিত্ত ঐক্য এ যুগেও শুধু সারা ভারতেই নয়,

সারা জগতেরই বিস্ময়ের বস্তু। পঞ্চাশ লক্ষ নিরক্ষর কৃষককে এমনি ভাবে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন এমন জননায়ক আজ অবধিও ভারতে দেখা গেছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু ক'জন বাঙালী আজ মনে রেখেছে এই বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসকে ?

এই সংকটময় মুহূর্তে হরিশ্চন্দ্র মারা যান মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে।

দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" দোলা দেয় জাতির বুকে। পাদ্রী জেম্‌স্ লংএর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ ক'রে জেলে যান। হরিশ্চন্দ্র মারা গেলেন, লংসাহেব জেলে গেলেন। দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত বাঙালীর প্রাণের কথাই ছড়া হ'য়ে বেরুল সকলের মুখে মুখে ঃ—

"নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ্ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রথম শিলাইদহে গিয়ে পুরোনো নীলকুঠি দেখেছিলেন। তাঁর "ছেলেবেলা"তে অতি সংক্ষেপে অননুকরণীয় ভাষায় যা বলেছেন তাতেই নীলকর সাহেবদের প্রকৃতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

"পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নিচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার

জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউ গাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবদের ব্যবসার সংগে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দরবার একেবারে থম্‌-থম্‌ করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান। কোথায় লাঠি কাঁধে কোমরবাঁধা পেয়াদার দল। কোথায় লম্বা টেবিল পাতা খানার ঘর, যেখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা রাতকে দিন ক'রে দিত, ভোজের সংগে চলত জুড়িনৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটে উঠত শ্যাম্পেনের নেশা। হতভাগা রায়তদের দোহাইপাড়া কান্না উপরওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হ'য়ে চলত। সেদিনকার আর যা কিছু সব মিথ্যে হ'য়ে গেছে, কেবল সত্য হ'য়ে আছে তুই সাহেবের তুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাতুলি করে বাতাসে, আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাতনিরা কখনো কখনো তুপুর রাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ী পোড়ো বাগানে।"

(ছেলেবেলা, পৃষ্ঠা ৪৬)

সিপাহী যুদ্ধ

সারা ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সাল চিরস্মরণীয় ঠিক ১৭৫৭ সালের মতো।

পলাশী থেকে ইংরাজ কোম্পানী ক্ষমতা বিস্তার করতে করতে গ্রাস করে প্রায় সারা ভারত। কোম্পানীর ভারত শাসনের ইতিহাস স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের ইতিহাস। ক্লাইব থেকে শুরু ক'রে ডালহৌসি পর্যন্ত একটানা অমানুষিক অত্যাচার ও ছল, চাতুরী, মিথ্যার খেলাই চলে। দিল্লীর বাদশা বা অযোধ্যার নবাব বরাবরই ছিলেন কোম্পানীর অনুগত। কোম্পানীর সংগে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গিয়ে একে একে নিঃশেষ হ'য়ে গেল তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা, একটু একটু ক'রে দিতে হ'ল সবটুকু রাজ্য, সব ঐশ্বর্য ; কিন্তু কোম্পানীর বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা কিছুতেই মেটে না।

লর্ড ডালহৌসির লৌহশাসন প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করে ভারতের সর্বত্র। সাঁতারা, ঝাঁসি, নাগপুর রাজ্য তাঁর ইচ্ছামত এক অদ্ভুত আইনের বলে তিনি ইংরাজ-রাজ্যের এলাকা-ভুক্ত ক'রে ফেলেন। এমন অদ্ভুত কথা কোন্ দেশে কবে কে শুনেছে বা ভেবেছে যে, কোন রাজার ছেলে না হ'লেই সে রাজ্য হবে ইংরাজের ? যাঁর রাজ্য তাঁর মেয়ে রাজ্য পাবে না, নিকটতম

আত্মীয় পাবে না, তাঁর দত্তকপুত্র গ্রহণ করবার ক্ষমতা থাকবে না, তাঁর আপনার জন যাঁরা তাঁরা কিছুই নয়; ইংরাজ শুধু গায়ের জোরেই তাঁর রাজ্যের মালিক হবে।

অযোধ্যায় কুশাসন চলছে,—এই দোহাই দিয়ে নবাবকে পদচ্যুত ক'রে তিনি গ্রাস করেন সারা অযোধ্যা। অযোধ্যার হাজার হাজার তালুকদার ভূসম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হ'য়ে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে যায়। কোম্পানীর রাজ্য অধিকার করার একটা প্রধান লক্ষ্যই ছিল নিংড়ে নিংড়ে টাকা শুষে নেওয়া। এমন কি রাজমহিলাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সোনাদানাও কোম্পানীর ইংরাজ লুট করেছে নির্লজ্জ ভাবে। এই জঘন্য উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য চির-অন্তঃপুরিকা বেগম সাহেবাদের শোবার ঘরেও ঢুকেছে, বিছানা তুলে গয়না বার ক'রে লুট করেছে ইংরাজ। সভ্য বা ভদ্রজাতির কোন নিদর্শনই ছিল না তাদের ব্যবহারে।

ভারতের সব জায়গায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে সিপাহীদের মধ্যেও অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে থাকে।

পাঞ্জাব, রণজিত সিংহের স্বাধীন পাঞ্জাব সদ্য-দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ। মহারাণী ঝিন্দনের নির্বাসন, তাঁর নিতান্ত নাবালক পুত্রের সুদূর সমুদ্রের পরপারে নির্বাসন, শিখদের বুকে বজ্র হানে। পাঞ্জাবের বুকে চলে অত্যাচারের তাণ্ডব। অসন্তোষ ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে।

দেশী সেপাইরা যুদ্ধের সময় সাহস ও বীরত্ব দেখাত ইংরাজ

সৈনিকের চেয়ে ঢের বেশি, কিন্তু বেতনের সময়ে গোরা সৈনিক পেত মাসে চল্লিশ টাকা, আর দেশি সেপাই মাত্র ছ' টাকা। এতে কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করলে কি আর রক্ষা ছিল ? মনের কথা খুলে বললেই, বেশি মাইনের দাবী করলেই কর্তারা হতেন বিরক্ত। কাজেই অসন্তোষ প্রকাশ যে করত তাকেই ধরা হ'ত বিদ্রোহী ব'লে। চাকরী তো যেতই, ফাঁসিও দেওয়া হ'ত, কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়েও দেওয়া হ'ত।

কাজেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মনেই বিদ্বেষ জন্মায় ইংরাজ শাসনের উপর, বিশেষ ক'রে সেপাইদের মনে। এর ওপর ডালহৌসির সৈন্য-গঠন-নীতি সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহের বিষ সঞ্চার করে।

কোম্পানীর বাঙালী পল্টন, বোম্বাই পল্টন ও মাদ্রাজী পল্টন,—এই তিন পল্টন সেপাইএর মধ্যে যুদ্ধকৌশলে, বুদ্ধিতে ও একতায় বাঙালী পল্টনই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙালী পল্টন নাম হ'লেও এতে বাঙালী সেপাই ছিল না কেউ, সবই ছিল হিন্দুস্থানী। গুর্খাযুদ্ধে ও শিখযুদ্ধে এই বাঙালী পল্টনই ইংরাজকে জয়ী করেছিল গুর্খা ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে। এই জন্যই গুর্খা ও শিখরা বাঙালী পল্টনকে মনে করত তাদের পরম শত্রু। এই জন্যই সৈন্যদলে গুর্খা ও শিখ নেওয়া হ'ল যথেষ্ট সংখ্যক।

এদিকে ১৮৫৬ সালে ডাল্‌হৌসি নিয়ম করলেন যে,

কোম্পানীর যে কোন হুকুম যারা বিনা আপত্তিতে মাথা পেতে নেবে শুধু তাদেরই নেওয়া হবে বাঙালী পল্টনে।

দেশের সংগে, সমাজের সংগে যাদের যোগাযোগ রয়েছে খুব ঘনিষ্ঠ, কোম্পানীর যে কোন হুকুম বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। কোম্পানী-বিদ্বেষ ক্রমাগত ধূমায়িত হ'তে লাগল, টোটার চর্বি শুধু আগুনটুকু জ্বালিয়ে দিল মাত্র।

সেপাইদের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে এলো। তারা এক হ'য়ে স্থির করলে যে, ইংরাজকে ভারত থেকে তাড়াতে না পারলে আর নিষ্কৃতি নেই, অতএব সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হবে একযোগে একই দিনে। মধ্যভারত, বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সেপাইরা একই সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করবে ২৩এ জুন তারিখে।

কিন্তু এই ব্যবস্থা বানচাল হ'য়ে গেল মে মাসেই। এই বাংলাদেশের বারাকপুরের সেনানিবাসে ইংরাজ অফিসারদের বাংলোতে জ্বলে উঠল আগুন। বিদ্রোহ শুরু হ'ল এই বাংলা-দেশেই প্রথম। বাংলার মাটির এমনই অদ্ভুত গুণ যে, মুক্তির সন্ধানও ভারতে সব চেয়ে আগে এসেছে বাংলারই মস্তিষ্কে, সারা ভারতকে পথও দেখিয়েছে সেই। বারাকপুরে যে আগুন জ্বলে' উঠল সেই আগুনই ছড়িয়ে পড়ল ভারতের দিকে দিকে।

১০ই মে বারাকপুরে সিপাহী মংগল পাঁড়ে গুলি ক'রে মারলে একজন ইংরাজকে দিনের বেলা সকলের সামনে। মংগল

পাঁড়ের যে ফাঁসি হ'ল তা বলা তো বাহুল্য মাত্র। এতে ফল হ'ল এই যে, ইংরাজরা বিদ্রোহের কথা জানতে পারলে। সাবধান হ'য়ে গেল তারা। কিন্তু সতর্কতা সত্ত্বেও যে প্রচণ্ডতা নিয়ে দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি প্রভৃতি জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তাতে এ সব জায়গায় ইংরাজদের প্রাণ দিতে হয়েছিল দলে দলে, ইংরাজের শাসন লোপ পেয়েছিল কিছু দিনের জন্য।

এই সিপাহী যুদ্ধই ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধ শুধু সিপাহীদেরই নয়, আরও ব্যাপক। ইংরাজ-শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই ছিল এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই জন্যই এই যুদ্ধকে বলা হয়—The First Indian War of Independence, অর্থাৎ ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ।

বিদ্রোহীরা দিল্লীর বাদশাকেই ভারতের বাদশা ব'লে ঘোষণা করে। কানপুরে নানাসাহের ও তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের কুমারসিংহ ছিলেন এই যুদ্ধের সব চেয়ে বড় নায়ক।

ইংরাজকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল এই বিদ্রোহ দমন করতে। বিলেত থেকে পাঠানো হ'ল গোরা সৈন্য দিয়ে কোলিন্ ক্যাম্বেল্‌কে। এই বিদ্রোহ দমনে তারা সাহায্য পেয়েছিল শিখদের, গুর্খাদের, বহু দেশীয় রাজাদের আর বিশিষ্ট বহু লোকের, তবু এই বিদ্রোহ দমনে সময় লেগেছিল পুরো দুটি

বছর। এতে ইংরাজের কৃতিত্ব খুব বেশি নেই, কারণ তারা মাছের তেলেই মাছ ভেজেছে; ভারতবাসীদের দিয়েই ভারতবাসীদের সর্বনাশ করেছে।

কি নৃশংস প্রতিশোধই না নিয়েছিলো ইংরাজ! দিল্লীর বাদশাকে করা হ'ল বন্দী এবং নির্বাসিত করা হ'ল সুদূর ব্রহ্মদেশে। তাঁর ছেলে ও নাতীদের অত্যন্ত নৃশংসভাবে দিল্লীর রাস্তায় হত্যা করা হয়।

বিচার নেই, বিবেচনা নেই, পুরুষ নেই, নারী নেই, বালক-বালিকা ভেদ নেই,—সন্দেহ হ'লেই হ'ল, একমাত্র দণ্ড হ'ল ফাঁসি। যেখানে-সেখানে গুলি-চালনা, গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা প্রতিদিনের ঘটনা হ'য়ে দাঁড়াল। দিল্লী থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের গাছে গাছে দেওয়া হ'তে লাগল ফাঁসি। শত শত মাইল ব্যাপী বিশাল রাজপথের গাছে গাছে ঝুলতে লাগল ভারতবাসীর শব। অবর্ণনীয় নৃশংসতার ফলে অযোধ্যার মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

নানাসাহেবকে ইংরাজ কোন দিনই ধরতে পারে নি; তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। অর্থলোভে এক বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দেয় তাঁতিয়া তোপীকে। বীরপুরুষ অম্লান মুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় ধারণ করেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরাংগনা লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে আহত হ'য়ে প্রাণ দেন। কুমারসিংহ আদর্শ ক্ষত্রিয় বীরের মতোই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শত্রুর অস্ত্রাঘাতে।

বাংলাদেশ থেকেই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু এখানে এর প্রবলতা বিশেষ কিছুই ছিল না। তবু কলকাতার ইউরোপীয়ানদের মধ্যে দেখা দিল গভীর আতংক ও উত্তেজনা। নিজেরা স্বেচ্ছা-সেবক দল গঠন ক'রে তারা শুরু করে কুচ-কাওয়াজ। চারদিকে সশস্ত্র ইংরাজ-সৈন্য দাঁড় করিয়ে আর বারুদভরা কামান পেতে বারাকপুরের সেপাইদের তো আগেই নিরস্ত্র করা হয়েছিল। বড়লাট লর্ড ক্যানিংএর চারদিকে শুধু সশস্ত্র ইংরাজ-সৈন্য পাহারা দিতে লাগল।

তারপর হাত দেওয়া হ'ল দেশী ছাপাখানার ওপর। সরকার ইচ্ছা করলেই যে কোন সংবাদ-পত্র বা পুস্তকের প্রচার বন্ধ করতে পারতেন। অস্ত্র আইনও হ'ল অত্যন্ত কঠোর।

অযোধ্যার নবাবকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল কলকাতায়, পাছে নবাবের দ্বারা কোনও রকম ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এই জন্য তাঁকে নিয়ে আটকে রাখা হ'ল কলকাতার দুর্গের মধ্যে।

তখন চট্টগ্রামে একদল সেপাই ছিল। তারা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করতে না করতেই ইংরাজরা ছদ্মবেশে পালিয়ে যায় জংগল দিয়ে। কাজেই সেপাইরা বিনা বাধায় লুট করল ধনাগার, পুড়িয়ে দিল সেনানিবাস, উড়িয়ে দিল অস্ত্রাগার। তারপর তারা ছুটল ত্রিপুরার দিকে।

ত্রিপুরার রাজা এদের আক্রমণ করেন। এরা পালিয়ে যায় মণিপুরের জংগলে। সেখানে শ্রীহট্টের সেপাইদের গুলিতে এদের

অনেকেই নিহত হয়। ত্রিপুরার রাজা এবং শ্রীহট্টের সেপাইয়ের দল এমনি ক'রে সাহায্য করেছিল ইংরাজকে।

এর পর ঢাকার মালগুদাম ও ধনাগারের সেপাইদের নিরস্ত্র ক'রে ইংরাজ সেনানায়কগণ গিয়ে উপস্থিত হ'ল লালবাগ কেল্লায়। সেপাইরা চালাতে লাগল গুলি। সেনানায়কদের কাবু ক'রে ঢাকা ছেড়ে তারা চ'লে গেল জলপাইগুড়ির দিকে। তিস্তানদীর তীরে হউল সাহেব তাদের আক্রমণ করেন; কিন্তু সেপাইদের গতি রোধ করতে পারলেন না। শেষে তারা নেপালের জংগলের মধ্য দিয়ে অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পালিয়ে যায়।

চৈত্র-মেলা

মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হ'ল ভারতের সব জায়গায়। ভারতের শাসন ব্যবস্থা আর কোম্পানীর হাতে রইল না, শাসনের ভার নিলেন মহারাণী নিজে। এক কথায় ইংরাজের পার্লামেন্টের অধীন হ'ল ভারতবর্ষ। সারা দেশ হ'য়ে যায় স্তিমিত। এই রকম একটা শান্তি বা মোহতে জাতি হ'য়ে পড়ে অবসন্ন বা নিদ্রিত। কিন্তু বাঙালীর মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় রইল না।

সারা ভারতে বাঙালীই প্রথম ভাবতে শুরু করে,—কোম্পানীই হোক আর পার্লামেন্টই হোক, সেই ইংরাজের হাতেই তো শাসন রইল। শাসন ও শোষণ যেমনি প্রবল ছিল তা তেমনিই চলবে, বরঞ্চ আরো বেশি প্রবল হবে। ইংরাজ জাতির সভ্যতার নমুনা তো ঢের দেখা গেছে। সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পার হ'য়ে ইংরাজ কি ভারতে এসে ছলে বলে কৌশলে শিকড় গেড়েছে ভারতেরই কল্যাণের জন্য ? এ হ'তেই পারে না ; এই মারাত্মক ভুলই, এই তথাকথিত শান্তি বা নিষ্ক্রিয়তাই দেশকে ও জাতকে ধ্বংস করবে। অতএব এই ঘুমের মোহ কাটাতেই হবে।

এই জন্যই প্রথম প্রয়োজন সারা ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি, এবং সংগে সংগে সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ইত্যাদির উন্নতি। বিদেশীর ওপর সব

জিনিসের জন্য নির্ভর করতে হ'লে দেশের অর্থ সবই বেরিয়ে যায় বিদেশীর হাতে, জাতি হ'য়ে পড়ে দরিদ্র। দরিদ্র জাতি পেটের চিন্তায়ই যদি সব সময় ছট্‌ফট্‌ করে তো আর কি করতে পারে?

এই উদ্দেশ্যে বাঙালী এক অভিনব উপায় সৃষ্টি করে। এই উপায় হ'ল চৈত্র-মেলা। নবগোপাল মিত্র এবং কবি মনোমোহন বসুই ছিলেন এই মেলার প্রাণ। এই মেলা প্রথম বসে ১৮৬৭ সালের চৈত্র মাসে। প্রতি বছরই সভার প্রারম্ভে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গান গাওয়া হ'ত।

"মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান,
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্‌ স্থান? কোন্‌ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।" ইত্যাদি—

জন্মভূমির অতীত গৌরবের ইতিহাসের প্রতি, জন্মভূমির সকল রকমের উন্নতির প্রতি, এবং সকল সন্তানের একমন এক-প্রাণ হওয়ার প্রতি জনগণের মন আকর্ষণ করত এই সংগীতটি।

ভারতের স্বাধীনতা এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও সাহিত্য ও কাব্যই যে ঐক্য, সাম্য ও রাজনীতিক আন্দোলনের প্রাণশক্তি জোগায়, চৈত্র-মেলার স্রষ্টারা এইটি খুব ভাল ক'রে বুঝেছিলেন। রাজনীতিক নেতাদের আকাশ-ফাটানো হাজার বক্তৃতার চেয়ে একটা কবিতা, একটা গানের শক্তি যে অনেক বেশি তার বহু

প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, The pen is mightier than the sword, অর্থাৎ তরোয়ালের চেয়ে কলমের জোর বেশি। এইটি খুব ভাল ক'রে বুঝেছিল ব'লেই বাঙালী শুধু রাজনীতি নিয়েই মাতামাতি করেনি।

চৈত্র-মেলার বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সাহিত্যের বিভাগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল খুব বেশি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, কিন্তু লেখক ও কবি হিসাবে যাঁরা পারিতোষিক পেয়ে সহস্র কণ্ঠের প্রশংসা লাভ করেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন।

ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত এই চৈত্র-মেলাই রাষ্ট্রীয় চেতনার সংগে সংগে অন্যান্য বিষয়েও জাতির মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও চৈতন্যের সৃষ্টি করে।

বাংলাই এই সময়ে উপলব্ধি করে সর্বভারতীয় ঐক্য ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংঘ। এই উপলব্ধি ও চিন্তা থেকেই ইণ্ডিয়ান্ য়্যাসোসিয়েশন্ বা ভারত-সভার সৃষ্টি।

ভারতের জাতীয়তার জনক দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ই ছিলেন ভারত-সভার প্রাণ। সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সারা ভারতের এক রাজনীতিক চিন্তা, এক কর্ম-প্রণালী ও এক আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বহুদিন পর কংগ্রেস যে সারা ভারতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেন, অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনাকে যে একই কর্ম-প্রণালীর মধ্য দিয়ে

নিতে চেষ্টা করেন, কংগ্রেস সৃষ্টির বহু পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ সেই পরিকল্পনা করেন এবং তা কাজে প্রয়োগ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইটালীর মহামানব ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ দিকে দিকে প্রচার করতে শুরু করেন স্বাদেশিকতা। তাঁর অন্তরের বজ্রগম্ভীর বাণী বাংলা প্রদেশের গণ্ডী ডিঙিয়ে যায় ভারতের দূর-দূরান্তে, দিগ-দিগন্তে। অপূর্ব তাঁর প্রেরণা, অপূর্ব তাঁর বাগ্মিতা, নিদ্রিত আত্মবিস্মৃত জাতির কানে ও মনে প্রবেশ করে স্বাদেশিকতার মন্ত্র। জাতির ঘুম ভাঙতে থাকে ; নতুন কথায়, নতুন সুরে একটা বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয় দেশে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আলোকের রেখা যেমন ক'রে মনকে সতেজ করে, তেমনি ক'রেই সুরেন্দ্রনাথের দীপ্ত বাণী ও প্রাণভরা প্রয়াস জাতির নিস্তেজ মনে দেয় তেজ, দেয় শক্তি। তাঁর পরিচালিত কাগজ "বেঙ্গলী" জাতীয়ভাব দিকে দিকে প্রচার ক'রে জাতিকে সজাগ ও সক্রিয় করবার চেষ্টা করে।

যে যুগে তিনি এই বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে জাতীয় মুক্তির ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, সেই যুগের কথা ভাবলে তাঁকেই ভারতের রাষ্ট্রগুরু ব'লে প্রণাম না ক'রে পারা যায় না। কাঁটাবন কেটে ভিত পত্তন ক'রে ইঁট গেঁথে ইমারত তৈরি করলেন যিনি, তাঁর চেয়ে চূণকাম করলেন যাঁরা তাঁরাই দেশের কাছে বড় কিনা ভাববার বিষয় নয় কি ?

ঋষি বংকিমের মুক্তি-মন্ত্র

সিপাহী যুদ্ধের পর বাঙালীর জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীর চিন্তাশীলতাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশ-জননীর দিকে। এই যুগের বাংলা সাহিত্য ও কাব্য প্রেরণা জোগায় বাঙালীর মনে।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত-সংগীত" বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের মনে একটা প্রচণ্ড নাড়া দেয়। সকলেই ভাবতে শুরু করে—জগতের সকল জাতিই স্বাধীন, যারা স্বাধীন ছিল না তারাও নিজেদের ক্ষমতায় স্বাধীনতা অর্জন করেছে, জাতির সম্মান-বোধ সকলেরই আছে, নেই শুধু ভারতবাসীর। ভারত-সংগীতের প্রথম স্তবকটি এই :—

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

কবি মনোমোহন বসুর গান ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর কণ্ঠে—

"দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন !
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।

বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশে কি দুর্দ্দিন !"

কবি গোবিন্দ রায়ের সংগীত বাংলার শহরে ও গ্রামের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর বুকে দোলা দেয় ;—

"কতকাল পরে বল ভারত রে !
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষে নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর দাসখতে সমুদায় দিলে।
* * *
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
পর লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে,

পরদীপ মালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।”

সিপাহী যুদ্ধের অল্প পরেই প্রকাশিত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যানের বিশেষ অংশ সেই যুগ থেকে আজ অবধিও তরুণ বাংলার কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে আসছে ঃ—

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।”

এই যুগে স্বদেশীভাব-মূলক বহু নাটক রচিত হয়, সরকার অনেকগুলি নাটকেরই অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন। এই সব নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ।' দীনবন্ধুর শক্তিশালী লেখনী নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ উৎপীড়নের যে ছবি এঁকেছে তাঁর বিখ্যাত নাটকে, তাতে বাঙালী উঠেছিল শিউরে। সেই যুগের বাঙালী কৃষকের

অবর্ণনীয় দুর্গতির অমর ইতিহাস এই নাটকখানি। ইংরাজের বিচারের প্রহসনও এই সময় থেকে বাঙালী ভাল ক'রে বুঝতে শুরু করে।

জাতীয়তা ও জাতীয় মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক ঋষি বংকিমের সাহিত্য। বংকিম-সাহিত্য বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটা বিশেষ যুগ সৃষ্টি করে। বাংলার তথা ভারতের নব অভ্যুদয় হয়েছিল তাঁরই রচনা দ্বারা। বংগ-জননীর অতীত রূপ, বর্তমান রূপ এবং ভবিষ্যৎ রূপ, 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন এবং মা যা হইবেন,' এই রূপ তিনিই মুদ্রিত ক'রে দেন বাঙালীর হৃদয়ে। তখনকার এবং তার পরবর্তীকালের সমস্ত মুক্তি-প্রচেষ্টার প্রেরণার উৎসই তাঁর সাহিত্য।

ঋষি বংকিমের 'আনন্দমঠ' তরুণ বাংলাকে মুক্তি-প্রচেষ্টায় এতই অনুপ্রাণিত করে যে, বহু বাঙালী যুবক দেশের জন্য প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন, নিজের রক্ত দিয়ে অংগীকার-পত্রে স্বাক্ষর ক'রে। 'আনন্দমঠে'র সন্তানদের বন্দে-মাতরম্-সংগীত শেষে পরিণত হয়েছে সারা ভারতের জাতীয় সংগীতে। বাঙালী বন্দে-মাতরম্‌কে গ্রহণ করেছিল মুক্তি-মন্ত্ররূপে। এই মন্ত্র জপ ক'রেই তারা হাসিমুখে ইংরাজের লাঠি নিয়েছে মাথায়, গুলি নিয়েছে বুকে, ফাঁসির দড়ি পরেছে গলায় ফুলের মালার মতো। 'আনন্দমঠ' মুক্তিকামী বাঙালীর জীবন-বেদ।

বংকিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' বিদেশীর নির্মম শাসন ও শোষণে নিস্তেজ বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করে বাহুবল অর্জনে। বংকিমচন্দ্রের সাহিত্যই সমাজতন্ত্রবাদের সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়, সাম্যবাদ প্রচার করে। বাঙালীর জীবনে নব নব চিন্তার প্রবর্তন করেন তিনিই।

জাতীয় মহাসভা

কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে। যে ভারত-সভার কথা আগে বলা হয়েছে, সেই ভারত-সভারই আদর্শ ও কার্যক্রম মোটামুটি কংগ্রেসেরও আদর্শ ও কার্যক্রম।

ইংরাজের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা ক'রে, রাজভক্তি জ্ঞাপন ক'রে এই নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ভারত-সভাই এর জন্মদাতা।

সুরেন্দ্রনাথের ভাবধারা ছিল বিপ্লবাত্মক। এই ভাবধারা প্রচারের ফলে তিনি অপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন ইংরাজ মহলে, আর রাজভক্ত মহলে অর্থাৎ বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভারতীয় মহলেও বিশেষ অপ্রিয় হন। এইজন্যই যখন বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে, তখন এই বিশিষ্ট ভারতীয় মহলই সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দেন, তাঁকে আমন্ত্রণই করেন না, পাছে তাঁর কণ্ঠে বেসুরো কথা বেজে ওঠে।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পরে নিজের অদ্ভুত শক্তিদ্বারা সুরেন্দ্র-নাথই গ্রহণ করেন কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং কংগ্রেসকে পরিণত করেন সর্বসম্প্রদায়ের একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানে।

তখনকার দিনে কংগ্রেসের শুরুতেই ভারতবাসীর রাজভক্তি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ত। অন্য যে সব প্রস্তাব

গ্রহণ করা হ'ত, তা শুধু কাগজেই লেখা থাকত, কাজে কোন দিনই কিছু করা হ'ত না। সারা বছরের পর বড়দিনের ছুটিতে ভারতের নানা দিক থেকে ধনী, মানী ও বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাছা বাছা কতক লোক এক জায়গায় জমায়েত হতেন, বক্তৃতা করতেন এবং কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। এমনি ক'রেই কংগ্রেস চলছিল। এ যেন একটা বার্ষিক উৎসব।

এই জন্যই এতে সমস্ত আস্থা হারিয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে বলেছিলেন,—জনগণকে জাগাতে হ'লে সংগঠন চাই, প্রতিদিন জনগণকে নিয়ে কাজ করা চাই, এই কাজের একটা বিশেষ পরিকল্পনা চাই। নইলে কংগ্রেসের মূল্য কি? এ-তো শুধু একটা বার্ষিক তামাসা মাত্র, আর কিছুই নয়।

শুধু অরণ্যেই রোদন করলেন অশ্বিনীকুমার। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা কানেই তুললেন না তাঁর কথা। কাজেই তিনি বাধ্য হ'য়ে তাঁর নিজের জেলা বরিশালকেই ক'রে নিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র। এইখানেই সংগঠনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন নিজের পরিকল্পনা অনুসারে।

বছরে বছরে ইংরাজের কাছে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন, আর আইন বাঁচিয়ে অতি মোলায়েম বক্তৃতায় সবল ইংরাজ যে মোটেই কর্ণপাত করে না, বরং তার মূর্তি আরও রুদ্র হ'য়ে ওঠে, তরুণ বাঙালীর সে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে; কিন্তু প্রবীণ-নেতারা

কিছুতেই এই প্রতিবাদ আর আবেদন-নিবেদন ছাড়া আর কিছু করতে সাহস করেন না।

এই জন্যই তরুণ সম্প্রদায় ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলে কংগ্রেসের ওপর। আবেদন-নিবেদন, যুক্তি, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি যে সাম্রাজ্যবাদের নেই বাঙালী যুবকেরা তা বুঝেছিলেন হাড়ে হাড়ে। সাম্রাজ্য-লোভী ইংরাজ কবে সাধু হবে, কবে সে লোভ ত্যাগ ক'রে তিলক কেটে বৈরাগী হবে, এ আশায় তো আর একটা জাত অনন্তকাল লাঞ্ছনা ভোগ করতে পারে না। তা ছাড়া কংগ্রেস তখন স্বাধীনতার কথাও উচ্চারণ করে নি। ইংরাজের কাছে কিছু সুযোগ-সুবিধা, ভারতীয়দের মোটা মোটা চাকরী, কোন কোন বিষয়ে অধিকার পেলেই কংগ্রেস তখন সন্তুষ্ট। কংগ্রেসের যে লক্ষ্য স্বরাজ, অর্থাৎ ইংরাজ-রাজের অধীনে স্বায়ত্বশাসন, তাও ১৯০৬ সালের আগে জানতে পারা যায় নি।

তরুণ বাংলা শুরু করে পথের সন্ধান। এই সন্ধানের ফলেই তারা অবলম্বন করে গুপ্ত পথ। খুব সম্ভব ১৯০০ সালে বাংলায় প্রথম গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালে যে গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং এর সভ্যরা যে দেশের নানা জায়গায় বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

কংগ্রেস নিতান্ত নরমপন্থী হ'লেও সরকারের অন্যায় কার্য-

কলাপের আলোচনা তখন শুরু ক'রে দিয়েছেন। অনেকের বক্তৃতায় বেশ উত্তাপ প্রকাশ পেতে লাগল।

এদিকে ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন হ'য়ে আসেন ভারতের বড়লাট। ইনি ছিলেন ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী। ইনি স্পষ্ট ভাষায়ই জানিয়ে দিলেন যে, দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করাই এঁর ভারত শাসনের মূল; একটি হচ্ছে ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করা, আর একটি ভারতে ইংরাজের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা।

লর্ড কার্জন বুঝেছিলেন যে, বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ বেড়ে চলেছে। প্রবীণ নেতারা যাই বলুন না কেন, নবীনরা তাঁদের কথায়ই সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকবে না, থাকতে পারে না। কাজেই বাংলাদেশকে যদি দুর্বল ক'রে না রাখা হয় তা হ'লে বাংলার রাজনীতিক আকাশে যে ছোট্ট এক টুকরো কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে, তা সারা ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলবে অদূর ভবিষ্যতে।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের বংগবিভাগের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জন ভেবেছিলেন, বাঙালী জাতিকে দু'ভাগ ক'রে দিলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, বাঙালী দুর্বল হবে। বাংলাদেশ শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় ভারতের সকল প্রদেশের অগ্রগামী, সুতরাং কংগ্রেস এবং ভারতের জনগণের নেতৃত্ব করছে বাংলাদেশই, কাজেই এই জাতির মধ্যে যে কোন রকমেই হোক ফাটল ধরানো চাই-ই। এর পর

কংগ্রেসকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারলেই ভারতের বুকে ব'সেই সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা চলবে বহুকাল। এই জন্য তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে তোয়াজ ক'রে কংগ্রেস থেকে আলাদা ক'রে রাখবারও চেষ্টা করেন।

বাংলাকে তুইভাগে ভাগ করবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ওঠে তীব্র প্রতিবাদ দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে। প্রবল আন্দোলন শুরু হ'য়ে যায় বাংলার শহরে শহরে, পল্লীতে পল্লীতে। বংগ-ভংগ আন্দোলনই বাংলার জন-সাধারণকে সজাগ ক'রে দেয় ধাক্কা মেরে। কিন্তু কোটি কণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদ ব্যর্থ হ'য়ে যায় ইংরাজ শাসকের কাছে। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়।

দেশব্যাপী শুরু হ'ল বিদেশী বর্জন। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন-চন্দ্রের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে বিদেশীদ্রব্য বর্জনের সংকল্প। লিভারপুলের লবণ ব্যবহার একদম ছেড়ে দিয়ে বাঙালী নিয়েছিল কর্‌কচ্‌ নূন। "বংগলক্ষ্মী" কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাঙালীর প্রথম কাপড়ের কলের মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিল বাংলার নরনারী। বহুদিন ধ'রে সিগারেট খাওয়ায় অভ্যস্ত শিক্ষিত লোকেরাও সিগারেট ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন বিড়ি খেতে। এমনি ক'রে অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যই বর্জন ক'রে বাঙালীই সর্বপ্রথম চেষ্টা করে সব রকমে স্বাবলম্বী হ'তে এবং বিদেশী বণিকের শোষণ বন্ধ করতে।

আগেই বলা হয়েছে যে, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত সংঘ গঠন ক'রে স্বাদেশিকতা প্রচার শুরু করেছিলেন বরিশাল জেলার সকল জায়গায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে। তাঁরই নির্দেশে ও উপদেশে পরিচালিত বরিশালের চারণ-কবি মুকুন্দ দাস দিকে দিকে গান গেয়ে নিরক্ষর নরনারীদেরও অনুপ্রাণিত করেন স্বদেশী গ্রহণে ও বিদেশী বর্জনে। সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবাত্মক পালা তৈরি ক'রে এবং পালার মধ্যে অসংখ্য গান যোজনা ক'রে নিজের মনের মতো কর্মী নিয়ে দল তৈরি ক'রে এক-একদিকে অভিযান করতেন গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগরের সকল শ্রেণীর সকল লোকের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

এর ফলে বিদেশী বর্জন এমনি সফল হয়েছিল যে, বরিশাল শহরে ইউরোপীয়রা চা খাবার জন্য এক ছটাক চিনিও পায় নি কোথাও। এ রকম বর্জন আর কোনও দিন বাংলাদেশে হয় নি, আর কোন প্রদেশে হয়েছে কিনা জানা যায় নি।

অশ্বিনীকুমারকে এজন্য নির্বাসন-দণ্ড এবং মুকুন্দ দাসকে কঠোর করাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

কংগ্রেস তখনও বিশ্বাস হারালেন না ইংরাজের ন্যায়পরতায়। কংগ্রেস থেকে তখনও আবেদন-নিবেদন চলতে থাকে ইংরাজের দরজায়।

ইংরাজ-শাসনতন্ত্র শুরু করে নির্মম উৎপীড়ন, অসহনীয় অত্যাচার। দেশকে ভালবাসা, দেশের কথা বলাও শাসকের

কাছে হ'ল মারাত্মক অপরাধ। শুধু বন্দে-মাতরম্ উচ্চারণ করার অপরাধে অসংখ্য যুবকের মাথা লাগল ফাটতে পুলিশের লাঠির ঘায়ে, বুক লাগল ফুটো হ'তে পুলিশের বেয়োনেটে ও গুলিতে। সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয়ে গেল পুলিশের তাণ্ডব। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিটাই যেন ইংরাজ-শাসনকে বিকল করে তুলল।

দেশের যুব-শক্তি এতে স্থির থাকতে পারলে না। তাঁরা অগ্নি-পরীক্ষার দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দেশের মুক্তি চাই-ই, মুক্তি-সাধনায় প্রাণ বিসর্জন তুচ্ছ মনে ক'রে বাংলার বিশিষ্ট চরিত্রবান তরুণ মুক্তি-দূতেরা সংঘবদ্ধ হলেন খুব গোপনে, শাসকদের সম্পূর্ণ অগোচরে।

বংগ-ভংগ আন্দোলন

বংগভংগ বাঙালী জাতির ওপর প্রচণ্ডতম আঘাত। জাতির পক্ষে এই আঘাতই যে কল্যাণের সূচনা করেছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। বংগভংগকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তেমন আর কোন দিনই হয় নি।

লর্ড কার্জন যে শুধু বাংলাদেশকেই দু'ভাগ ক'রে বাঙালী জাতিকেও দু'ভাগ ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন তা নয়, হিন্দু-মুসলমানেও অমিল ঘটাবার জন্য রীতিমত প্রচারকার্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ নিয়ে হ'ল পশ্চিম বাংলা, আর ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে হ'ল পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলার লাটসাহেব ব্যাম্‌ফিল্ড্ ফুলার বলেছিলেন,—হিন্দু-মুসলমান তাঁর দুই রাণী, হিন্দু দুয়োরাণী আর মুসলমান সুয়োরাণী। ইংরাজ-শাসকের রাজনীতিক খেলা চলল এই ভাবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বংগের অংগচ্ছেদের বিরুদ্ধে অননুকরণীয় লেখনী ধারণ ক'রে বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করেন। "এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশের
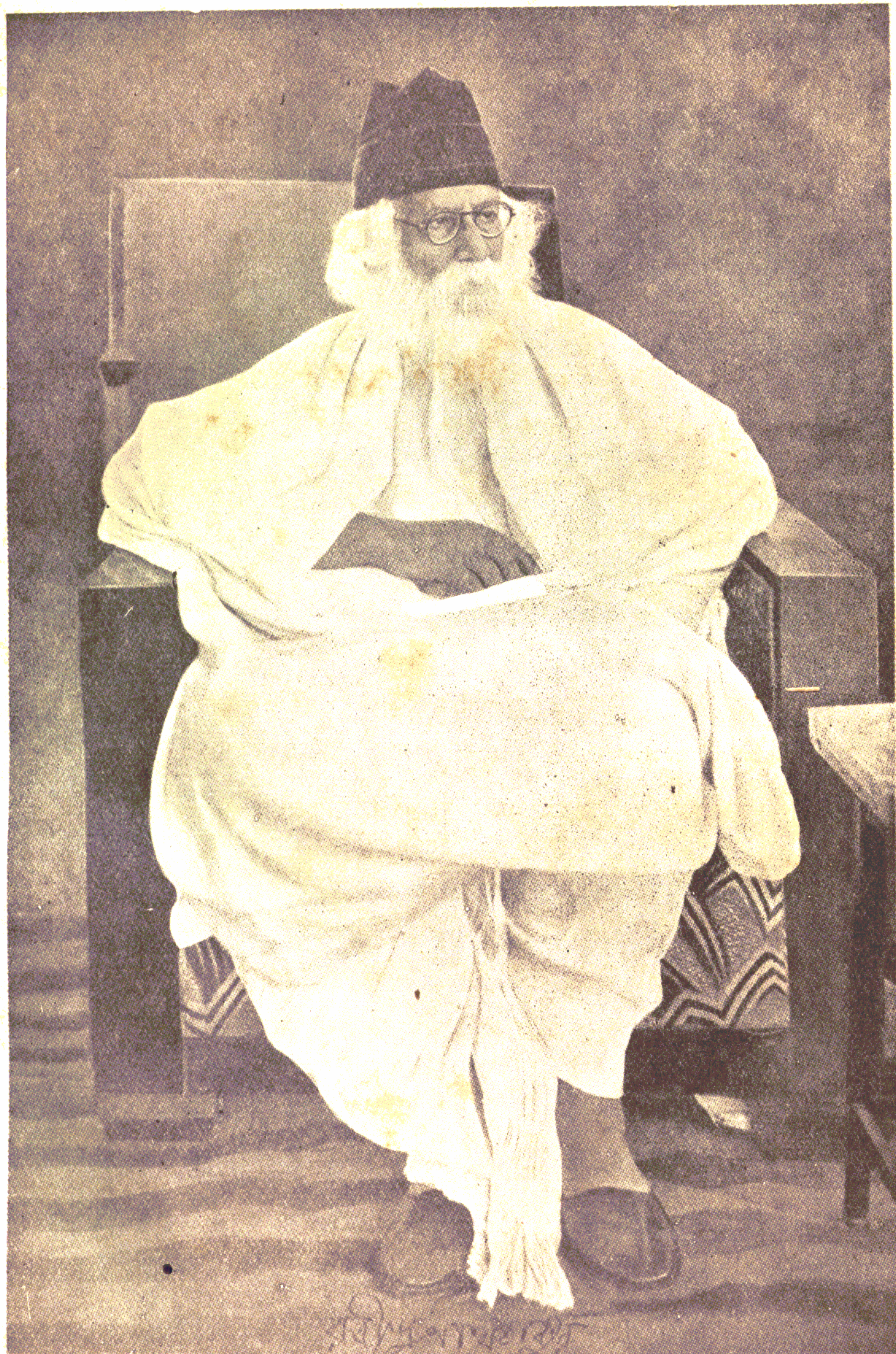
রবীন্দ্রনাথ

ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বংগদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ-বিধান করিয়া আসিয়াছে ; জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।”

ইংরাজের এই রূঢ় আঘাতের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বাংলার সর্বত্র শুরু হ’ল বিদেশী দ্রব্য বর্জন। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল. কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস প্রভৃতির রচিত সংগীত, এবং রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির প্রবন্ধ উদ্বেলিত ক’রে তোলে বাঙালীর হৃদয়কে। এদিকে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মোক্ষদাপ্রসাদ সামধ্যায়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তিশালী বক্তারা বাংলার দিকে দিকে বক্তৃতা দিয়ে মাতিয়ে তোলেন সমস্ত বাঙালী সমাজকে।

মুসলমানদের সুয়োরাণী ব’লে তোয়াজ করলেও বহু মুসলমান এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। আবদুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেনই তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এর ফলে বাংলাদেশে এমন একটি পল্লীগ্রামও ছিল না, যেখানে বর্জন-আন্দোলনের উন্মাদনা প্রকাশ পায় নি।

বংগের অংগচ্ছেদ হয় ৩০শে আশ্বিন। এই দিনটিকে বাঙালী গ্রহণ করে শোকের দিন ব’লে। উভয় বংগের মিলনের

চিহ্নস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ "রাখী-বন্ধনের" প্রস্তাব করেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রস্তাব করেন অরন্ধনের।

শোকের চিহ্নস্বরূপ বাঙালী ৩০শে আশ্বিন অন্নজল গ্রহণ করত না, কোন ঘরে উনুন জ্বল্‌ত না। সকলে থাকত খালি পায়ে। দোকানপাট, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, গাড়ী-ঘোড়া সব থাকত বন্ধ। ভোর থেকে সকলে বন্দে মাতরম্ গাইতে গাইতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, রবীন্দ্রনাথের 'রাখী-বন্ধনের' বিখ্যাত গানটি সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে একে অন্যের হাতে রাখী বেঁধে দিত—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক্, পুণ্য হউক্,
পুণ্য হউক্, হে ভগবান!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক্, পূর্ণ হউক্,
পূর্ণ হউক্, হে ভগবান!
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক্, সত্য হউক্
সত্য হউক্, হে ভগবান!

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক্, এক হউক্,
এক হউক্, হে ভগবান !"

সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'বেংগলী', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী' ও ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' স্বদেশী প্রচারে নিয়োজিত ছিল। এই আন্দোলনের মধ্যে নতুন ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার 'নবশক্তি'। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন চরমপন্থী। 'সন্ধ্যা'য় তিনি প্রচার করতেন যে, স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে নিজের শক্তিদ্বারা, অপরের অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে নয়।

স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা বাংলার সর্বত্রই প্রায় সমান হ'লেও বরিশালের তীব্রতা হয়েছিল সব চেয়ে বেশি। ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা বরিশালকে আইন-শৃংখলা ভংগকারী জেলা Proclaimed district) ব'লে ঘোষণা করেন।

বরিশালের কৃতিত্বের কথা পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। বরিশালকে জব্দ করবার জন্যে বরিশাল শহরে ও বানরিপাড়া এবং অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় সরকার মোতায়েন ক'রে রাখল গুর্খা পুলিশ। কিন্তু গুর্খা পুলিশের বর্বর অত্যাচারও আন্দোলন দমন করতে পারেনি সেখানে। বিলাতী জিনিস এক ছটাকও বিক্রী হয় না দেখে স্থানীয় কয়েকজন লোক দিয়ে

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বিলাতী জিনিসের দোকান বসালেন। কিন্তু বসালে কি হবে? একটি পয়সার জিনিসও বিক্রী হ'ল না। এই কারণেই বরিশালকে বলা হ'ত স্বদেশীর পীঠস্থান।

বিদেশী শাসনের রুদ্রমূর্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে বাংলার সকল জায়গায়। স্বদেশী আন্দোলন তখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, প্রায় উদাসীন এ সম্বন্ধে। বাংলাদেশ যেমনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, নব নব চিন্তার উন্মেষে ভারতের সকল প্রদেশের অগ্রণী, জাতীয়তার এবং জাতীয় সংগ্রামেরও পথ-প্রদর্শক এই বাংলাদেশই।

১৯০৬ সালে নিখিল বংগ রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হওয়ার ব্যবস্থা হয় বরিশালে। এর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন অশ্বিনীকুমার, তাঁর সহকর্মী ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেক বিশিষ্ট কর্মী।

আয়োজন পূর্ণ হ'য়ে এলো। এদিকে কর্তাদের হুকুম বেরুল, পূর্ববংগে প্রকাশ্য রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' বলা বে-আইনী। এই বে-আইনী আইন জারি করে 'বন্দে মাতরম্' বলার অপরাধে পূর্ববংগের অসংখ্য যুবকের মাথা ফাটল পুলিশের লাঠিতে, পিঠ কেটে রক্ত বেরুল বেতের ঘায়ে। আরো নানা রকমের সাজা হ'তে লাগল অনেকের।

বাংলার সকল জেলা থেকে প্রতিনিধি আসেন বরিশালে। বাংলার সকল নেতা—সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপিনচন্দ্র পাল

কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতি বরিশালে এলেন। স্থির হ'ল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করবার পর শোভাযাত্রা বেরুবে।

সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল চললেন শোভাযাত্রার সামনে। তাঁর পেছনেই সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রভৃতি। শোভাযাত্রা মাত্র রাস্তায় বেরিয়েছে, তখনও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা হয় নি, অমনি পুলিশ ফৌজ বেপরোয়া লাঠি চালাতে শুরু করে সকলের ওপর। বহু লোক হ'ল আহত, কয়েক-জনের আঘাত হ'ল গুরুতর, বিশেষ ক'রে চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার। পুলিশের লাঠির ঘায়ে তাঁর মাথা ফেটে যায়, তিনি ছিটকে পড়েন পাশের একটা পুকুরে এবং মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করতে থাকেন। পুলিশ সেই অবস্থায় জলের মধ্যেও তাঁর ওপর লাঠি চালায়। অন্য একজন পুলিশ তাঁকে জল থেকে টেনে তোলে, নইলে চিত্তরঞ্জনের সেই দিনই হ'ত সলিল-সমাধি। এর ফলে সকল স্বেচ্ছাসেবকই চিত্তরঞ্জনের সংগে সংগে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি ক'রে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন।

পুলিশ সাহেব তখনই সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুরেন্দ্রনাথের বিচার ক'রে জরিমানা করেন।

সম্মেলনের আবহাওয়া এতে যথেষ্ট উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। দমননীতি যে মানুষের মন দমন করতে পারে না, এ বোধ শাসকের কোন দিনই থাকে না, ইংরাজেরও ছিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিশ সাহেব দ্বিতীয় দিনে সম্মেলনে এসে জানিয়ে দিলেন যে, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করলেই সভা ভেঙে দেওয়া হবে জোর ক'রে। এই হীন শর্তে কে রাজী হয়? কাজেই সম্মেলনের কাজ বন্ধ করা হ'ল।

বাঙালীর বুকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগীত দেয় অপরিমেয় শক্তি—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে—
ততই মোদের বাঁধন টুটবে—
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে—
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই,
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই
তন্দ্রা ততই টুটবে—
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।"

রক্তে যাদের লেগেছিল সর্বনাশের নেশা (১)

সারা বাংলা স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে উদ্বেলিত হ'য়ে আছে। ইংরাজ-শাসন চলেছে লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মতো।

তরুণ বাংলা তাকায় কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেসের কণ্ঠ আগের চেয়ে জোরালো হ'ল ব'টে, কিন্তু আবেদন-নিবেদনের পালা সমানেই চলতে থাকে। বাংলার বিশিষ্ট তরুণ সম্প্রদায় আস্থা হারিয়ে ফেলে প্রধান নেতাদের ওপর। নেতাদের মধ্যেও মতের অনৈক্য হওয়ার ফলে দুইটি দলের সৃষ্টি হ'ল; এক দল নরমপন্থী, আর একদল চরমপন্থী ব'লে পরিচিত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলার একটি বিশিষ্ট তরুণ সম্প্রদায় দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে পথের সন্ধান করে। ১৯০০-১৯০১ সালে এদের দ্বারাই গুপ্ত-সমিতির সৃষ্টি হয়।

বাংলার এই গুপ্ত-সমিতি গোপনে গোপনে চারদিকে বিশেষ ক'রে শিক্ষিত ও চরিত্রবান যুবকদের মধ্যে বিপ্লবের ভাবধারা প্রচার শুরু করে। বাংলার জেলায় জেলায় বিপ্লববাদীদের শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের বিশ্বাস ছিল এই যে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কখনও কোন রাষ্ট্রের মুক্তি আসে না এবং জনগণেরও কল্যাণ হয় না, আর দেশও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় না। কিন্তু

অস্ত্রবল ও অর্থবল না হ'লে দেশব্যাপী বৈপ্লবিক কোন গণ-আন্দোলন হওয়া সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের গোড়াপত্তন হিসাবেই এই বিপ্লবীদল কাজ শুরু করেন।

বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। বিপ্লবীদের দেহচর্চা, বিদ্যাচর্চা, নৈতিক সংযম এবং আদর্শে অটল বিশ্বাস ছিল অপরিহার্য। এক কথায় এই সব তরুণ বিপ্লবী ছিল সর্বস্বত্যাগী, পূর্ণ-সংযমী, প্রগাঢ় মননশীল সন্ন্যাসী। স্বদেশের মুক্তির জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য অকুণ্ঠ চিত্তে আত্মত্যাগ করাই এদের জীবনের ব্রত। এরাই একালের দধীচি।

বহু অল্পবয়স্ক মেধাবী ছাত্র যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী দলে। মুক্তির আকাংক্ষা তাঁদের দুর্বার। তাই তাঁরা স্বদেশী গান গেয়ে গেয়ে শোভাযাত্রা ক'রে গিয়ে সভা জমাতেন, দলে দলে গিয়ে বিলিতি জিনিসের দোকানে পিকেটিং করতেন। তাঁদের দমন করবার উদ্দেশ্যেই সরকার থেকে হুকুম বেরুল যে, ছাত্রদের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া চলবে না। বহু ছাত্রকে স্কুল-কলেজ থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়, বেত মারা হয়। বাংলার নেতৃবৃন্দ এই সময়ে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং প্রধানত সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দানে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিপ্লববাদী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদা কলেজে ৭০০৲

মাইনে পেতেন। তিনি এই কাজ ছেড়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হ'য়ে আসেন মাত্র ১০০৲ বেতনে।

সে শিক্ষা পরিষৎ নেই বটে, কিন্তু মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত শিক্ষা পরিষদেরই যাদবপুরে প্রতিষ্ঠিত টেকনিক্যাল স্কুল বর্তমান যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জনক।

আগেই 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাগজগুলি সবই চরমপন্থী। এই সব কাগজের মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক ভাবধারা প্রচার করেছেন শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা। কিন্তু নিছক বিপ্লবের ভাবধারাই তো প্রচারিত হ'ত না এতে। বাংলার বিপ্লবী দল একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করেন, নাম 'যুগান্তর'। এর প্রকাশের মূলে রইলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই 'যুগান্তর' সত্যিই তরুণ বাংলায় যুগান্তর সৃষ্টি করে। একদিকে ঋষি বংকিমের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি রচনা, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমমূলক সাহিত্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও প্রবন্ধ, অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'বর্তমান রণনীতি', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' প্রভৃতি রচনা ; আর একদিকে দল-গঠন, অস্ত্র তৈরি, আত্মত্যাগ সম্বন্ধে

আগুনের ভাষায় লিখিত 'যুগান্তরের' প্রবন্ধগুলি প্রবল প্রেরণা দিতে থাকে বাংলার যুব সম্প্রদায়কে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁদের মনে গেঁথে দেয় এই আদর্শ যে, শুধু প্রাচীন ভারতের বিগত মহিমা আর নয়, অসংখ্য গণ-মানুষের গড়া নবীন ভারতই হ'ল কাম্য। তাই বিশ্ববিজয়ী স্বামীজির ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ দিন-রাত ফুটে ওঠে তাঁদের মানসপটে। "...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাংগল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে ; জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জংগল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। * * * * অতীতের কংকালচয়,—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হ'য়ে, অদৃশ্য হ'য়ে যাও ; কেবল কান খাড়া রেখো ; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতে উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরুজী কি ফতে'।"

বিবেকানন্দ

বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস, পরে হেমচন্দ্র কানুনগো নামে পরিচিত, ফ্রান্সে গিয়ে বোমা তৈরি শিখে এসে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতির সংগে বোমা তৈরি করতে থাকেন।

এদিকে সরকারের মূর্তি হ'য়ে ওঠে প্রচণ্ডতর। অত্যাচার চলে নৃশংসভাবে। সংবাদপত্রের, বিশেষ ক'রে বিপ্লবের সমর্থক ও বিপ্লব প্রচারে ব্রতী কাগজগুলির কণ্ঠরোধ করা হয় সুবিধামাফিক আইন ক'রে। শুধু সন্দেহে বাঙালী ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হ'তে থাকে, আর একটানা চলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড।

১৯০৭ সালে 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর হ'ল এক বছরের সশ্রম কারাবাস। এর পরেই ধরা হ'ল 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দকে, আর তার পরেই 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে।

ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন—ইংরাজের ক্ষমতা নেই যে তাঁকে বন্দী করে। তাঁর মামলা চলবার সময়েই দেহত্যাগ ক'রে তাঁর কথা তিনি রক্ষা করেন।

শ্রীঅরবিন্দের মামলায় বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধেও সরকার পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। তখন কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন কিংস্-ফোর্ড সাহেব। তাঁর ওপরই বেশির ভাগ স্বদেশী মামলার বিচারের ভার থাকত। অনেক সময় ছেলেদের ওপরও নির্মম

বেত্রাঘাতের আদেশ তিনি দিতেন, এমনি নির্দয় ছিলেন তিনি। বিপিনচন্দ্রের মামলাও হচ্ছিল তাঁরই এজলাসে।

এই বিচার দেখবার জন্য ভীড় জমে যায় খুব বেশি। একটা সার্জেণ্ট কয়েকটা নিরীহ লোককে ভীষণ ঘুষী মারে। সুশীল সেন নামে মাত্র চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে সহ্য করতে না পেরে সার্জেণ্টের মুখে ঘুষী মেরে এর জবাব দেয়। কিংস্‌ফোর্ড সাহেব তখনই সুশীলকে পনেরো ঘা বেত মারবার হুকুম দেন। সাহেবের হুকুম তখনই প্রতিপালন করা হয় অক্ষরে অক্ষরে।

এই ঘটনায় বিপ্লবীদের রক্ত ফুটে ওঠে টগবগ ক'রে। তাদের নজর পড়ে কিংস্‌ফোর্ডের ওপর। এই শাসনতন্ত্রের সকলের ওপরে ছিলেন লাট সাহেব। বিপ্লবপন্থী যুবকেরা বাংলার লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের জীবননাশের চেষ্টা করে তিন বার, তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয় তিনবারই। এদিকে কিংস্‌ফোর্ডকে জজ ক'রে কলকাতা থেকে পাঠানো হয় মজঃফরপুরে।

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবার প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু যান মজঃফরপুরে। প্রফুল্ল চাকীর সংগে বাংলার সকল বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের যোগ ছিল, ক্ষুদিরামও কলকাতার বিপ্লবী দলের সহিত যুক্ত ছিলেন। ভুলক্রমে তাঁরা গুলি করেন কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ী মনে ক'রে কেনেডি নামে এক সাহেবের গাড়ীর যাত্রীদের। নিহত হলেন কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও
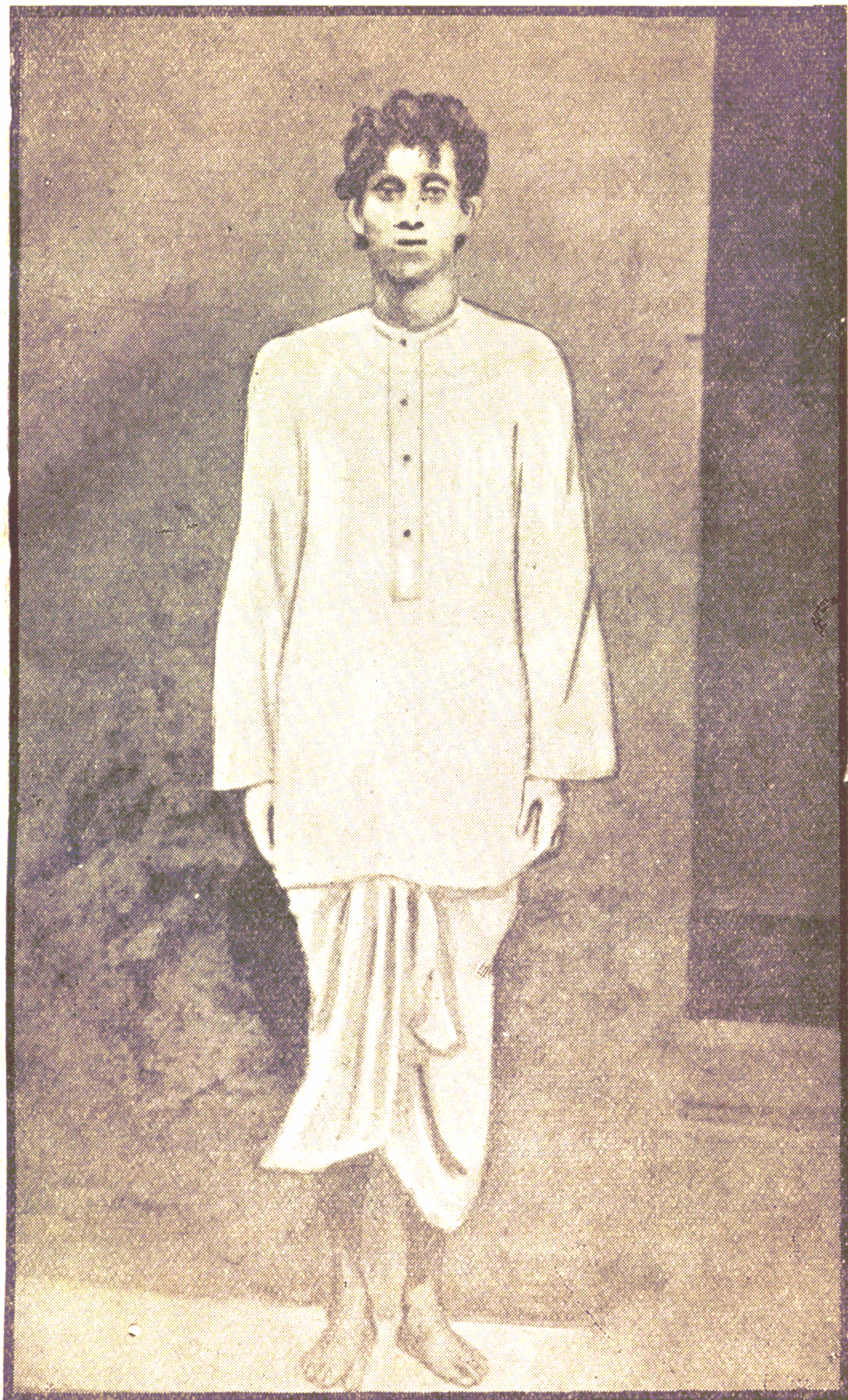
ক্ষুদিরাম বসু

কন্যা। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা ক'রে পুলিশকে ফাঁকি দিলেন, ক্ষুদিরামের হ'ল ফাঁসি।

এর পরই পুলিশ সন্ধান পায় কলকাতার মানিকতলায় একটা বোমার কারখানার। এই জায়গাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভৃতিকে। ঐ দিনই শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয় গ্রে ষ্ট্রীটে। মোট ৩৬ জনকে জড়িয়ে এক বিরাট রাজনীতিক মামলা শুরু হয়।

এদিকে নরেন গোস্বামী পুলিশের কাছে গোপন কথা ফাঁস করতে শুরু করে। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু তাঁকে জেল-খানার মধ্যেই গুলি ক'রে মেরে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দিয়ে ফাঁসি গেলেন। ফাঁসির পূর্বে কানাইলালের দেহের ওজন খুব বেড়ে গিয়েছিল দেখে সকলেরই তাক লেগে গিয়েছিল।

'যুগান্তর' দলের বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন দত্ত, হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল, দেবব্রত বসু, শৈলেন বসু প্রভৃতি পনেরো জনের হ'ল দ্বীপান্তর। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদ্ভুত যুক্তিবলে।

ক্ষুদিরাম যে আদর্শের অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বেলে রেখে গেলেন, তা অনুপ্রাণিত করে বহু বাঙালী তরুণকে। তাই

যে দারোগাটি প্রফুল্লকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাকে একটি ছেলে গুলি ক'রে মারে কলকাতায়। সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাস যুগান্তর দলের বিরুদ্ধে মামলা চালাচ্ছিলেন ব'লে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডান হাত নিয়েও চারু বসু নামে একটি ছেলে পুলিশকোর্টের মাঝখানেই তাঁকে গুলি ক'রে মেরে ফাঁসি যায়। পুলিশের একজন খুব বড় গোয়েন্দা মৌলবী সামশুল হক্‌কে বীরেন দত্তগুপ্ত নামে একটি ছেলে হাইকোর্টের সিঁড়িতেই গুলি ক'রে ফাঁসি গেল।

'যুগান্তরের' প্রকাশ ও প্রচারের আগে থেকেই বিপ্লবী ভাব-ধারা ছড়িয়ে যায় বাংলার নানান জায়গায়। এর মূলে ছিলেন ব্যারিষ্টার পি. মিত্র। ইনি আর বিপিনচন্দ্র পাল যান ঢাকাতে। কয়েকজন উকীল, যুবক আর ছাত্র নিয়ে দেশের কথা শুরু করেন তাঁরা। পি. মিত্রই সেখানে বলেন,—"ক্ষমতা থাকে তো ইংরাজকে তাড়াও, নয়তো মর।" তাঁরই উৎসাহে ঢাকায় একটি বিপ্লবী দল সৃষ্টি করা স্থির হ'য়ে গেল, আর এটাও স্থির হ'ল যে, সমস্ত যুবককে কাজ করতে হবে একই নায়কের অধীনে। নায়কের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করতে হবে।

কলকাতায় পি. মিত্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম দিয়েছিলেন 'অনুশীলন সমিতি,' ঢাকার সমিতির নামও তাঁরই নির্দেশে রাখা হ'ল 'অনুশীলন সমিতি'। পি. মিত্র এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন বংকিমচন্দ্রের অনুশীলন প্রবন্ধ থেকে। তিনিই হলেন সারা

প্রফুল্ল চাকী

বাংলার অনুশীলন সমিতির অধ্যক্ষ। পি. মিত্র এবং বিপিনচন্দ্র পালের সংগে তারকনাথ দাসও রংপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় বিপ্লবী দল সংগঠনের চেষ্টা করেন।

এ সময়ে তারক দাস গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী সেজে ঘুরে বেড়াতেন। কলকাতা থেকে গোপনে তিনি চ'লে যান আমেরিকায়।

একাত্তর জন ছাত্র ও যুবক নিয়ে ঢাকার অনুশীলন সমিতি গঠিত হ'ল। সমিতির নায়ক হলেন আনন্দ চক্রবর্তী, আর সকলের ইচ্ছায় পরিচালক নির্বাচিত হলেন পুলিনবিহারী দাস। কলকাতার সমিতি আর ঢাকার সমিতি একই অধ্যক্ষের অধীনে একইভাবে কাজ করতে লাগল। পুলিনবিহারী দাস মনে মনে আগে থেকেই বিপ্লবের কথাই ভাবতে শুরু করেছিলেন বংকিম-চন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' প'ড়ে এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে।

তাঁর জীবনেও তিনি পথ-নির্দেশ পেয়েছিলেন মহামানব বিবেকানন্দের বাণী থেকে। বীর সন্ন্যাসীর দীক্ষার মন্ত্র তাই তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে দিন-রাত।

"হে ভারত, ভুলিও না—* * * তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ের

ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

কলকাতায় পি. মিত্রের অধীনে সতীশ বসুর পরিচালনায় অনুশীলন সমিতির অনেকগুলি শাখা স্থাপিত হয়। অনুশীলন সমিতির সংগঠনের শক্তি ও প্রসারতা এতই বেশি হয়েছিল যে, শুধু এক ঢাকা জেলাতেই এর পাঁচ শত শাখা স্থাপিত হ'য়ে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। খুব অল্প দিনের মধ্যেই ঢাকা ছাড়াও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবী-বাজার, শিলং প্রভৃতি স্থানে বহু বহু শাখা স্থাপিত হয়।

পুলিনবিহারী দাসের অপূর্ব সংগঠন-শক্তিতে বাংলার শিক্ষিত জনগণের চিত্ত দোলা দিয়ে ওঠে। ইহজীবনের সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে বন্দিনী দেশজননীর মুক্তির ধ্যানে আত্মহারা এই নবীন সন্ন্যাসীর বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ও ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সক্রিয় সমর্থন লাভ করায় বরিশালে বিপ্লবের ভাবধারা সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যেই সঞ্চারিত হ'য়ে পড়ে।

অস্ত্র-শস্ত্রাদি সংগ্রহ প্রভৃতি বৈপ্লবিক প্রস্তুতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হ'ত। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য এই সব গুপ্ত-সমিতি মাঝে মাঝে ডাকাতি করত। "যারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, কপটাচারী, মদ্যপ, অসৎপ্রকৃতি, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারকারী, অপব্যয়কারী, জাতি অথবা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর, ধনী অথচ অতিরিক্ত কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাতি" করা হ'ত।* প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ত যে, নারী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় লোকের প্রতি কখনো কোনও রকম অত্যাচার করা হবে না।

এই নীতি অনুসারে অর্থ-সংগ্রহ এবং এই অর্থ দ্বারা গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকে। সমিতির সভ্যরা খুব নিষ্ঠার সহিত

---

*পুলিনবিহারী দাস লিখিত "বিপ্লব-যুগের কথা।" যুগান্তর—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৪ সাল।

নায়কের নির্দেশে নিজেদের প্রস্তুত করতে মন দেন। সমিতির কার্যসূচী মোটামুটি ছিল—লাঠি খেলা, অসি চালনা, কৃত্রিম যুদ্ধ, বেপরোয়া সাহসিকতা। এর সংগে চলে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা।

অনুশীলন সমিতির গঠন ও পরিচালনায় পুলিনবাবু সম্পূর্ণ অনন্যমনা হ'য়ে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সমিতির ব্যয় চালান স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বিক্রী ক'রে সর্বস্বান্ত হ'য়ে। পুলিশের গুপ্তচর তাঁর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের ওপর খুব কড়া নজর রাখত। তাই শেষটায় পুলিন বাবুকে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং তাঁর হ'ল নির্বাসন।

পুলিন বাবুর নির্বাসনের পর ঢাকার নরেন্দ্রনাথ সেন দলটিকে গুছিয়ে নেন তাঁর সহকর্মী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাংগুলি, রমেশ চৌধুরী, রমেশ আচার্য, জ্ঞান মজুমদার, রবি সেন, মদন ভৌমিক, নগেন্দ্র দত্ত, ফেগা রায়, যোগেন চক্রবর্তী, অমৃত সরকার প্রভৃতির সহযোগে। এঁদের সংগে জীবন ঠাকুরতা ও আশু কাহিলী যোগ দেন। দেশের জন্য এঁদের ত্যাগ অসীম,—এঁদের কৃতিত্ব অদ্ভুত, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

এঁরা যে কি রকমের মানুষ ছিলেন তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি কথায়ই ব্যক্ত হয়েছে অতি চমৎকার ভাবে। সিরাজগঞ্জে বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সময়ে দেশবন্ধু অনুশীলন সমিতির প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠান। আশুতোষ কাহিলী
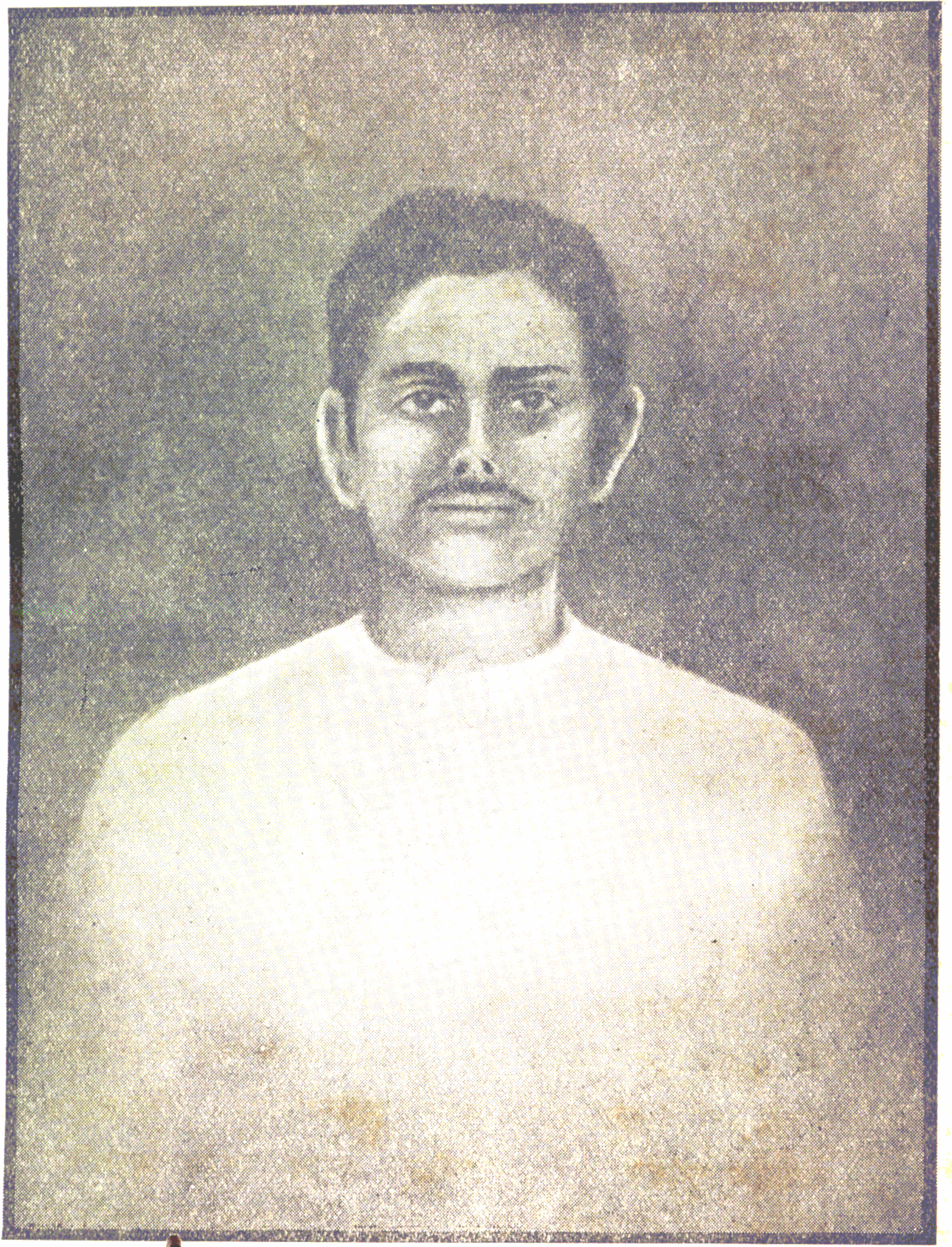
সত্যেন বসু

বিপ্লবীদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'য়ে দেশবন্ধুর সংগে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দেশবন্ধুর সামনে স্পষ্ট কথা ব'লে এবং তাঁর দলে যোগ না দেওয়ার যুক্তি দিয়ে বেরিয়ে আসেন। এতে কংগ্রেসের বিশেষ কয়েক জন লোক তাঁর ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'য়ে দেশবন্ধুকে বলেন,—আপনি যদি বলেন তো এই বিপ্লবী দলকে আমরা একেবারে শেষ ক'রে দেই।

দেশবন্ধু এর উত্তরে বললেন,—এদের সংগে মতের মিল না হ'তে পারে, কিন্তু আমি এদের শ্রদ্ধা করি, এরা দধীচি আর সব্যসাচীর combination.*

দেশবন্ধুর এই এক কথাতেই বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে লাখ কথা।

নরেন্দ্রনাথ সেনের ব্যবস্থায়ই গোয়ালন্দের প্লাট্ফর্মে খুন হয় য়্যালেন্ সাহেব, খুন হয় চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের চরিত্রহীন মোহান্ত, শ্রীহট্টের অরুণাচল আশ্রমের সন্ন্যাসীদের গুলি ক'রে মারবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মহকুমা হাকিমের খুনের ব্যবস্থাও এই সময়েই হয়।

অনুশীলন সমিতির সহিত মিলন হয় চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায়ের দলের। কলকাতায় রাজাবাজার অঞ্চলে এদের বিশিষ্ট কর্মীদের সংগে রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্র সান্ন্যাল প্রভৃতির

* শ্রীক্ষিতেশ লাহিড়ী প্রণীত "নমামি"।

দেখা-সাক্ষাৎ চলে, যোগাযোগ হয়। চন্দননগর থেকে মণীন্দ্র নায়েক এখানে এসে মাঝে মাঝে বোমা তৈয়ারির তত্ত্বাবধান করতেন।

এখানেই রাসবিহারী বসু পরামর্শ করেন দিল্লীর দরবারের শোভাযাত্রায় বড়লাটের ওপর বোমা ফেলা হবে কি না। অনেক আলোচনার পর সকলেই এই মত প্রকাশ করেন যে, অত্যাচারীর অত্যাচার কমাবার জন্য সন্ত্রাসবাদ বাঁচিয়ে রাখতেই হবে; সুতরাং রাসবিহারীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন সকলেই।*

নির্দিষ্ট দিনে দিল্লীর প্রধান রাজপথে লোকারণ্য। রাজপথের দু' পাশের বাড়ীর ছাদে অগণিত মহিলার সমাবেশ। বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে। হাতীর পিঠে ব'সে বড়লাট যখন একটা বাড়ীর সামনে এসেছেন, অমনি ছাদের ওপরের মহিলাদের মধ্য থেকে একজন মহিলার আঁচল ন'ড়ে উঠল। হাতীর ওপর বোমা পড়ল আর প্রচণ্ড শব্দে ফেটে কাঁপিয়ে দিল লক্ষ লক্ষ লোককে। বড়লাট রক্ষা পেলেন, কিন্তু মারা গেল তাঁর দেহরক্ষী। চারদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ প'ড়ে গেল। মহিলারা ছাদ থেকে নেমে পড়লেন হুড়্‌দাড় ক'রে, নারীর বেশধারী বসন্ত বিশ্বাসও বোমা মেরেই মহিলাদের দলে মিশে বেরিয়ে গিয়ে ঠিক রাসবিহারী বসুর সংগে মিলিত হলেন। আর তাঁদের পায় কে?

---

* শ্রীজিতেশ লাহিড়ী প্রণীত "নমামি"।

বংগ-ভংগ আন্দোলনের জোর যতই বাড়তে থাকে, বিপ্লবী দলের শক্তিও ততই বেড়ে যায়। বক্তৃতা আর বিলাতী দ্রব্যের বর্জন আন্দোলনে ইংরাজ তত বেশি ভয় খায় না, যতটা ভয় খায় সন্ত্রাসবাদকে। অত্যাচারী রাজকর্মচারীরা কোনখানেই নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারত না। চারদিকে বড় বড় ইংরাজ কর্মচারী এবং ইংরাজের দেশি কর্মচারীরা বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। ধরা প'ড়ে কত যুবকই না প্রাণ দিল ফাঁসিকাঠে বন্দে মাতরম্ ব'লে। পুলিশের সন্দেহেও অনেকের ফাঁসি হয়, দ্বীপান্তর হয়; কিন্তু বিপ্লবী বাংলা কিছুতেই দমে না।

রক্তে যাদের লেগেছিল সর্বনাশের নেশা (২)

বাংলার স্বদেশী ভাবধারা, এমন কি সন্ত্রাসবাদও বাংলার সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের দিকে দিকে। ভয়ের সঞ্চার হয় শাসকের মনেও। কাজেই ইংরাজ-সরকার বংগ-ভংগ রদ্ করেন। পূর্ববংগ আর পশ্চিমবংগ যুক্ত হ'য়ে গঠিত হ'ল বাংলা প্রদেশ।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ এতে খুশী হলেন। তাঁরা মনে করলেন তাঁদের আন্দোলনের ফলেই ইংরাজকে নত হ'তে হয়েছে। অসন্তুষ্ট কংগ্রেস সন্তুষ্ট হ'ল এতে। কিন্তু দলাদলিও শুরু হ'ল কংগ্রেসের মধ্যেই। আবেদন-নিবেদন ক'রে ইংরাজ সরকারের ক্ষমতার কিছু কিছু অংশ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন যাঁরা, তাঁরা দেশে পরিচিত হলেন নরমপন্থী ব'লে; অন্য দলকে বলা হ'ত চরমপন্থী। এই চরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

বিপ্লববাদীরা ভাবলেন—তুই বাংলা এক হ'লেও তো ইংরাজের কঠোর শাসন ও নির্মম শোষণ তো আর লোপ পাচ্ছে না। ইংরাজ থাকতে তো আর দেশ স্বাধীন হ'তে পারে না, অতএব বিপ্লবের পথেই এগুতে হবে।

বাঘা যতীন অর্থাৎ যতীন মুখোপাধ্যায় সারা ভারতব্যাপী একটা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন এই সময়ে। তিনি স্থির করেন, দশ-বিশটা অত্যাচারী লোককে গুলি ক'রে একটা আতংকেরই সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু দেশকে মুক্ত করা যায় না। যদি এক সংগে একই সময়ে ভারতের সর্বত্র বিপ্লব ঘটানো যায়, তবেই মুক্তি আসবে। কিন্তু এর জন্য বিরাট প্রস্তুতি চাই, কাজেই বহু বিশ্বাসী আত্মত্যাগী কর্মী চাই, প্রচুর অস্ত্রবল চাই এবং অস্ত্রচালনার জন্য সামরিক শিক্ষা চাই। এই পরিকল্পনা সমর্থন ক'রে তাঁর দলে এসে যোগ দেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বিপিন গাংগুলি, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত মুক্তিকামী কর্মী।

এদিকে ইউরোপে জার্মান-যুদ্ধ শুরু হয়েছে। জার্মানী ইংলণ্ডের ভীষণ শত্রু। তাই ভারত থেকে ইংরাজকে তাড়াবার সাহায্য পাওয়ার আশায় বিপ্লবীদল যোগাযোগ রাখলেন জার্মানীর সংগে, এবং জার্মানী থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানী করবার জন্য ভারতের বাইরে দুইটি ঘাঁটি করলেন, একটি বাতাভিয়ায় আর একটি ব্যাংককে।

বাঘা যতীন সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ভারতের নানা জায়গায় তিনি গড়লেন অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক

বাহিনী আর সিগ্‌ন্যালিং বাহিনী। এই সব বাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হ'ল।

তখন বিখ্যাত অস্ত্র-ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর ২০২ বাক্‌স অস্ত্র আসে বিলাত থেকে। কোম্পানীর নিরীহ এক কেরানী গেলেন সেই বাক্‌সগুলো আনতে। অফিসে এসে পৌঁছল ১৯২ বাক্‌স, দশ বাক্‌স অদৃশ্য হ'য়ে গেল পথে। এ থেকে পাওয়া গেল ৫০টি মশার পিস্তল আর ৪৬০০০ বুলেট। বাছা বাছা বিপ্লবীদের হাতে এই গুলো দিয়ে দিলেন বিপিন গাংগুলি। অবশ্য এই পিস্তল আর বুলেট ব্যবহার করা হ'ত তখনই যখন পুলিশের অত্যাচার চরমে উঠত।

এদিকে জার্মানী থেকে অস্ত্র আনাবার ব্যবস্থা হ'ল যে-সব বিপ্লবী ভারতের বাইরে ছিলেন তাঁদের চেষ্টায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন তারকনাথ দাস, চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, হেমন্তলাল গুপ্ত, লালা হরদয়াল ও চম্পক রমণ পিলে।

দেশের জনগণকে বাদ দিয়ে শুধু কয়েকজন বিপ্লবী দ্বারা দেশব্যাপী বিপ্লব ঘটানো যায় না। কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়েক শত লোকই বিপ্লবের সৃষ্টি করে, কিন্তু দেশের বেশির ভাগ লোকই তাদের কাজ সমর্থন করে। জনগণের সক্রিয় সমর্থন পাওয়ার মতো অবস্থা হ'লেই বিপ্লব সফল হয়, নইলে হয় না। এইটি খুব ভাল ক'রেই বুঝেছিলেন বিপ্লবী নায়ক যতীন মুখুজ্যে। তাই ভারতের এক একদিকে

জনগণের মধ্যে বিপ্লবের ভাবধারা এবং মুক্তির আকাংক্ষা জাগাবার উদ্দেশ্যে কাজ করবার ভার দিলেন এক একজন নায়কের উপর। যতীন মুখুজ্যে নিজে ভার নিলেন পূর্বভারতের, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব সহ উত্তর ভারতের ভার নিলেন রাস-বিহারী বসু, আর শচীন সান্ন্যাল ভার নিলেন ভারতীয় সিপাহীদের মনে বিদ্রোহের আগুন জালাবার। ভারতীয় সিপাহীদের মনে মুক্তির আকাংক্ষা জাগাতে না পারলে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, এটা তাঁরা বুঝেছিলেন বলেই এই চেষ্টা করেছিলেন।

অস্ত্র পাওয়ার পরই বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করা স্থির হয়। যাতে বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশ থেকে সৈন্য আসতে না পারে এজন্য বাঘা যতীন ভার নিলেন মাদ্রাজ রেলপথ উড়িয়ে দেবার, ভোলানাথ চাটুজ্যে বি. এন. রেলপথ, সতীশ চক্রবর্তী অজয়ের পুল। মাল নামাবার কথা ছিল সুন্দরবনে, আর মাল নামিয়ে নেবার ভার ছিল যাদুগোপাল মুখুজ্যের ওপর।

জার্মানী থেকে অস্ত্র নিয়ে জাহাজ বেরুল সম্ভব মতো গোপনীয়তা রক্ষা ক'রে। নানা দেশে, নানা পথে ইংরাজের গুপ্তচর থাকা সত্ত্বেও ইংরাজরা কিছুই টের পায়নি, কিন্তু বিপদ ঘটালো চেকোশ্লোভাকিয়ার কতকগুলি লোক। তারা ছিল জার্মানীর শত্রু, সুতরাং যুদ্ধের সময়ে জার্মানীর ক্ষতি করা এবং ইংরাজদের খুশী করার উদ্দেশ্যে তারা গুপ্তচরের কাজ করে। তারাই এই খবরটি ভারত সরকারকে জানায়।

এদিকে জাহাজ তো আর আসে না। নানান ঘাঁটিতে বিশেষ বিপ্লবী গেলেন ; কিন্তু গেলে কি হবে? ভারত সরকার সতর্ক ব্যবস্থা ক'রে বসেছে সকল পথে। ভোলানাথ চাটুজ্যে গেলেন গোয়াতে, ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে ; ভূপতি মজুমদার গেলেন চীনে, ধরা পড়লেন সিংগাপুরে। দুই লক্ষ টাকা, তিরিশ হাজার রাইফেল এবং অপরিমিত টোটা সহ জার্মান জাহাজ ধরা পড়ল ইংরাজের হাতে। অনেককেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারলে, কিন্তু রাসবিহারী বসু আর যাদুগোপাল মুখুজ্যের কোন সন্ধানই পেল না পুলিশ।

শেষটায় দেশি গুপ্তচরের দলই পুলিশের কর্তাদের খবর দেয়,—বাঘা যতীন আছেন ময়ূরভঞ্জের পার্বত্য অঞ্চলে। এবার পুলিশ দ্রুত প্রস্তুত হ'ল যতীন মুখুজ্যেকে ধরবার জন্য।

টেগার্ট সাহেব ছুটলেন একদল অশ্বারোহী নিয়ে। বাঘা যতীনের মতো ভারতের এত বড় বিপ্লবী নায়কের কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। সংগে ছিলেন তাঁর চারজন সহকর্মী—চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল।

আগে থেকেই বাঘা যতীন এঁদের নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন ট্রেঞ্চ কেটে বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূরে এক জংগলের মধ্যে। টেগার্ট অশ্বারোহী নিয়ে ঘিরে ফেললেন তাঁদের। দু'পক্ষেই গুলি বিনিময় চলল। চিত্তপ্রিয় গুলিতে
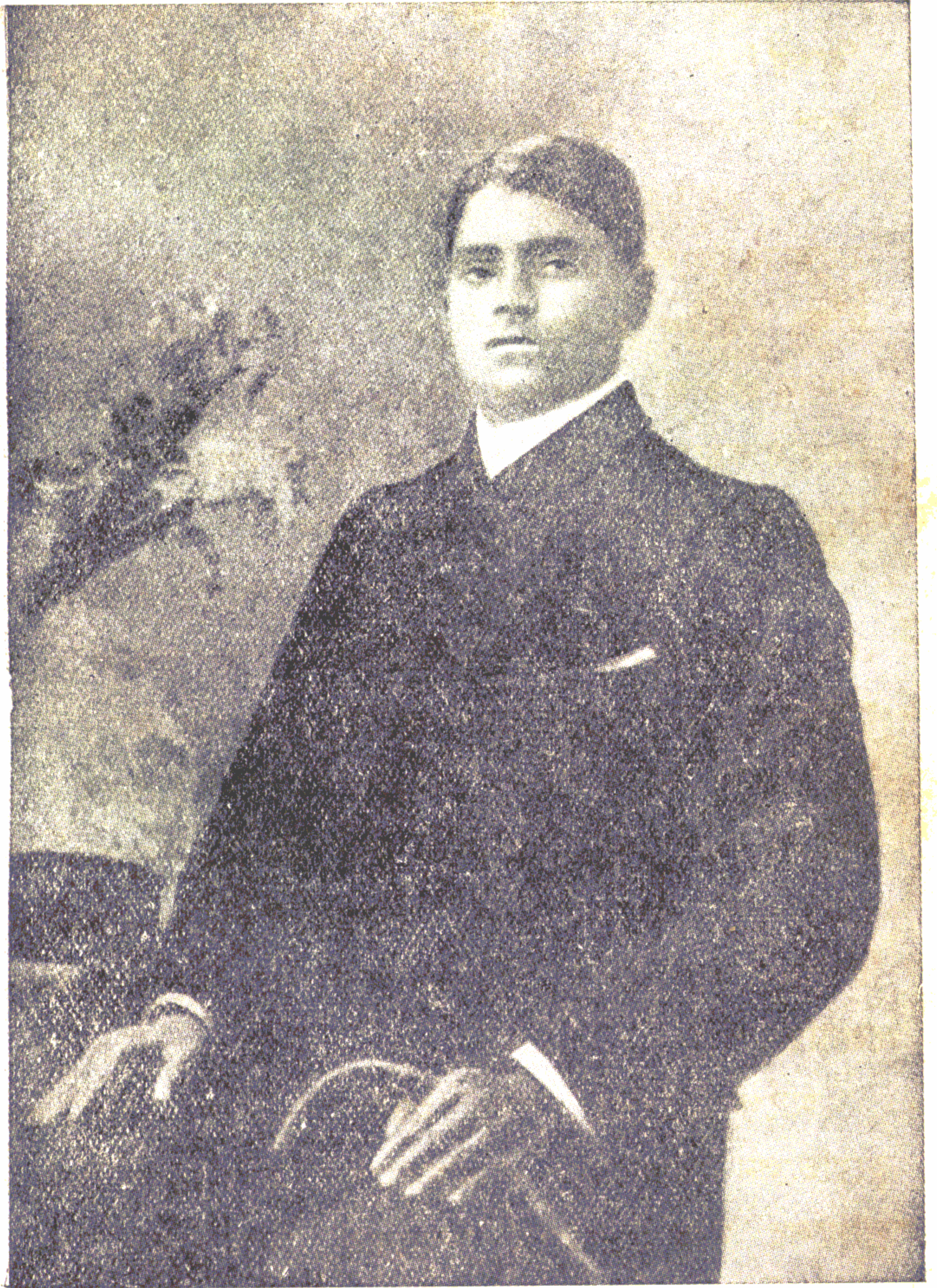
বাঘা যতীন

নিহত হলেন। যতীন মুখুজ্যে আহত হলেন তলপেটে গুলি লাগায়। মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ ও নীরেন ধরা পড়লেন তাঁদের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায়। বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ যতীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বালেশ্বর হাসপাতালে।

এই বীর পুরুষের প্রতি টেগার্ট সাহেবও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এইজন্য যে, তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি ট্রেঞ্চে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিয়েছেন।

মনোরঞ্জন ও নীরেনের হ'ল ফাঁসি আর জ্যোতিষের হ'ল দ্বীপান্তর।

ভারতব্যাপী বিপ্লবের এতবড় প্রস্তুতি সফল হ'তে পারল না।

বাংলায় অহিংস বিপ্লব

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে।

যুদ্ধের সময় বিপন্ন ইংরাজ বুঝেছিল যে ভারতের অর্থবল আর জনবল ছাড়া যুদ্ধজয়ের আশা তার কিছুমাত্র নেই, তাই ইংরাজের মুখে তখন ভারতের প্রশংসা আর ধরে না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ থেকে শুরু ক'রে বড় বড় ইংরাজ সকলেই বলতে শুরু করেছেন—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন (India is the brightest jewel on the British Crown). কাজেই যুদ্ধের পরই তাঁরা ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেবেন।

এই কথা ইংরাজের মুখে ক্রমাগত শুনে শুনে ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিরা বেশ খুশীই হলেন এবং যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করলেন সব রকমে।

ইংরাজের জয় হয়েছে এক লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণ ও এক হাজার কোটি টাকা দানের ফলে। এবার ভারত আশা করল আত্মনিয়ন্ত্রণের। তখনও ভারতের নেতাদের বুঝতে বাকী ছিল যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার মতো দুর্বলতা ইংরাজের কোন দিনই নেই। স্বার্থের জন্য যাকে সে মাথায় তোলে স্বার্থসিদ্ধি হ'লেই তাকে সে ফেলে পায়ের তলায়।

তাই ভারতবাসীকে ইংরাজ যুদ্ধ জয়ের প্রথম পুরস্কার দিলে জালিয়ানওয়ালাবাগে।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভা হচ্ছিল। দশ হাজার নর-নারী, বালক-বালিকা সমবেত হয়েছে। বাগের চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আসবার পথ মাত্র একটি। জেনারেল ডায়ার হঠাৎ সেই পথটি বন্ধ ক'রে দেয় কামান, বন্দুক আর সেপাই দিয়ে। সামনে দেশি সেপাই, পেছনে ইংরাজ সেপাই।

হঠাৎ জেনারেল ডায়ারের হুকুমে চলল গুলি-বর্ষণ। দেশি সেপাইরাই গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

মুহূর্তের মধ্যে প্রায় এক হাজার নিরীহ লোক, ছোট ছোট ছেলে আর মেয়ে রক্তশয্যায় শু'য়ে পড়ল জন্মের মতো, আর দেড় হাজার আহত হ'য়ে মর-মর হ'য়ে প'ড়ে রইল।

এত বড় পৈশাচিক ব্যাপারের জন্য ইংরাজ-সরকার ডায়ারকে দোষী বলে মনে করে নি। শুধু এই নয়, এর পরে ইংরাজ মহিলারা তিন লাখ টাকা তুলে ডায়ারকে পুরস্কার দিলে এই অদ্ভুত বীরত্বের জন্য! পাঞ্জাবে ইংরাজের এই বর্বরতায় ভারত স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, ভারতের নেতৃবৃন্দের ভুল ভাঙল।

বাংলাদেশ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছুটে গেলেন পাঞ্জাবে। মহাত্মা গান্ধীও সেখানে গেলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের ঘটনায় ব্যথিত হ'য়ে ইংরাজ সম্রাটের প্রদত্ত নাইট্

উপাধি বর্জন ক'রে রাজ-প্রতিনিধিকে চিঠি লেখেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অত্যাচারীর প্রদত্ত সম্মান লজ্জাকর ব্যাপার, সুতরাং সম্রাট-প্রদত্ত সম্মান প্রত্যাখ্যান ক'রে লাঞ্ছিত, অসহায় দেশবাসীর সংগেই তিনি দাঁড়াতে চান।

ইংরাজের এই ব্যবহারে ব্যথিত হ'য়ে মহাত্মা গান্ধী শুরু করেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইংরাজ-শাসকের সংগে সহযোগিতা করা আর সম্ভব নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র পাল অসহযোগের মূলনীতি স্বীকার করেন, কিন্তু কর্মসূচীর কোন কোন বিষয়ে অমত প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, আইন-সভা বিষবৎ পরিত্যাজ্য, কিন্তু দেশবন্ধু আইন সভায় প্রবেশের পক্ষপাতী।

নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর কর্মসূচী দেশবন্ধু মেনে নেন সাময়িক ভাবে। এইবার তিনি রাজার মতো ঐশ্বর্য্য, প্রাসাদতুল্য বাসভবন—সব ত্যাগ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসহযোগ সংগ্রামে। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং বাংলাদেশের সকল জায়গার নেতৃবৃন্দ।

দেশবন্ধুর আকুল আহ্বানে বাঙালী মনে-প্রাণে যোগ দিল এই আন্দোলনে। বাংলাদেশে উঠল তুমুল ঝড়। চলল পুলিশের বেপরোয়া ঠ্যাঙানি। দেশবন্ধু তো জেলে গেলেনই, সকল নেতাই কারাবরণ করলেন। বহু হাজার যুবক গিয়ে বাংলার

জেলখানা বোঝাই ক'রে দিলে। হিন্দু-মুসলমান যুবক এতই গ্রেপ্তার হ'ল যে, জেলে আর স্থান হয় না। সারা দেশটাই পরিণত হ'ল কয়েদখানায়। এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান এক মন, এক প্রাণ হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মার খাওয়া আর জেলে যাওয়া হ'ল বাঙালীর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এর সংগেই আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা ধার্য হয়। দিনও স্থির হয়। দেশময় বিলাতী দ্রব্য বর্জন সমানেই চলতে থাকে। বাংলাদেশে এটা তখন মোটেই নতুন নয়; কারণ বংগ-ভংগ আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলায় বিলাতী বর্জন চলছিল। অসহযোগ আন্দোলনে অস্পৃশ্যতা বর্জন, চাকরী বর্জন, খেতাব বর্জন, আইন আদালত বর্জন ইত্যাদি ছিল একটা বৈশিষ্ট্য।

সব ঠিক হ'য়ে আছে আইন অমান্যের জন্য। ইতিমধ্যে চৌরিচৌরায় হল এক কাণ্ড। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার অতিষ্ঠ হ'য়ে সেখানকার কতকগুলি লোক থানায় আগুন লাগিয়ে পুলিশ কর্মচারীদের মেরে ফেলে। এই হিংসাত্মক কাজের জন্য মহাত্মাজী আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। আন্দোলনের তীব্রতা এতে অনেকটা কমে গেল।

দেশবন্ধু এর পরে নতুন কার্যসূচী প্রবর্তন করতে গিয়ে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে বাধা পেলেন মহাত্মাজীর শিষ্যদের কাছে; কিন্তু কোন বাধা না মেনে তিনি স্বরাজ্যদল গঠন

করলেন এবং ভারতের সর্বত্র গিয়ে, দিনরাত প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে তাঁর কর্মসূচী ব্যাখ্যা ক'রে কংগ্রেসে তাঁর স্বরাজ্যদলেরই বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন মাত্র তিন মাসের মধ্যেই। দেশবন্ধুর ডান হাত সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন স্বরাজ্যদলের সফলতার জন্য অন্য সব চিন্তা ভুলে গিয়ে অবিরাম কাজ করতে থাকেন।

এই সময়েই সারা বাংলা ও ভারতের যুবশক্তিকে দৃঢ় ভাবে সংঘবদ্ধ করেন সুভাষচন্দ্র। নিখিল বংগ ও নিখিল ভারত যুব-সম্মেলন ক'রে সকল রকম ত্যাগের জন্য তিনিই তাদের অনুপ্রাণিত করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ সুভাষ সারা ভারতে সর্বশ্রেণীর অত্যন্ত প্রিয় হ'য়ে ওঠেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা, তেজস্বিতা, ত্যাগ ও স্বাজাত্যবোধের জন্য সকলেরই নিতান্ত আপনার জন হয়ে ওঠেন। সারা ভারতে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই ইংলণ্ডে গিয়ে মাত্র আট মাসের মধ্যেই আই. সি. এস্. পরীক্ষায় ইংরাজী রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ইংলণ্ডের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ইংরাজ ছাত্ররাও ইংরাজী পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে হার মানতে বাধ্য হয় ব'লে, ভারতীয় যুব-সমাজ ও ছাত্র-সমাজে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন দেশে ফিরে আসবার আগেই। কংগ্রেসে ও স্বরাজ্যদলে এই তরুণ সুভাষ উত্তেজনার বিদ্যুৎ সঞ্চার করেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

চিত্তরঞ্জন দাশ

১৯২৫ সালে পুরুষসিংহ পুণ্যশ্লোক দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণের পর তাঁর বিপুল কর্মভার গ্রহণ করেন যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধুর কর্মসূচীই মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস গ্রহণ করেন। কংগ্রেস এই কর্মসূচী নিয়েই শেষ পর্যন্ত কাজ করেছেন। দেখা গেল, দেশবন্ধুই ঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, যদিও গয়া কংগ্রেসে অধিকাংশই তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

ভারতের সকল প্রদেশে সমস্ত নির্বাচনেই স্বরাজ্যদলের অর্থাৎ কংগ্রেসেরই জয় হ'ল। ব্যবস্থাপক সভায়, মিউনিসি-প্যালিটিতে, ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডে অধিকাংশ আসনই দখল করেন কংগ্রেস। এর ফলে ব্যবস্থাপক সভা সরকারের সকল রকমের অপকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারত, অন্যায় আইন যাতে পাশ না হয় তার চেষ্টা করতে পারত; কিন্তু লাটসাহেব নিজের ইচ্ছায় ও বিশেষ ক্ষমতায় সব রকমের আইনই পাশ করতে পারতেন। সরকার পুলিশের ব্যয় হয়তো তিন-চার গুণ বাড়াতে চায়, ব্যবস্থাপক সভা এই ব্যয় বাড়ানোর বিরুদ্ধে ভোট দিলে, কিন্তু লাটসাহেব ব্যবস্থাপক সভার মত অগ্রাহ্য ক'রে পুলিশের ব্যয় বাড়ানোই মঞ্জুর করলেন। অতিরিক্ত টেক্স জনগণের ওপর চাপাবার প্রস্তাব নিয়ে সরকার উপস্থিত হলেন ব্যবস্থাপক সভায়, সভায় প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না; কিন্তু লাটসাহেব নিজের ক্ষমতায়ই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জনগণের

ওপর দিলেন টেক্‌স বসিয়ে। কাজেই ব্যবস্থাপক সভা অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারলে না কিছুতেই। কিন্তু দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভের আকাংক্ষা তখন জেগেছে। পুলিশ ও মিলিটারি ফৌজ দিয়েও তাদের দমিয়ে রাখা সহজ নয় বুঝতে পেরেই সুচতুর ইংরাজ হিন্দু আর মুসলমানের ঐক্য নষ্ট করবার চেষ্টা করে। রাজনীতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে বাংলা ভারতের যে কোন প্রদেশের চেয়ে ঢের বেশি অগ্রণী, তাই সর্বপ্রথমেই, স্বদেশী যুগেই বাঙালী জাতির মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে ইংরাজ।

মহামতি গোখেলে বলেছিলেন—Bengal is the brain of India. What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow. অর্থাৎ বাংলাই ভারতের মস্তিস্ক। বাংলা আজ যা ভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তা ভাবে ঢের পরে। মুক্তি-যুদ্ধেও দেখা গেছে, প্রত্যেক স্তরেই বাংলা যা বলেছে, যা করতে চেয়েছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ প্রথমে বাধা দিয়ে শেষে সেইটিই গ্রহণ করেছে। বাঙালীর এই অগ্রগামিতা ইংরাজ বুঝেছিল অনেক আগেই। তাই বাঙালী জাতিকে দুর্বল করবার জন্য সে নানা চক্রান্ত করেছে।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত হ'য়ে ওঠে এবং জনগণ উপলব্ধি করে ভারতবাসী মাত্রেই

এক জাতি, মুক্তির সংগ্রামে হিন্দু বা মুসলমান ব'লে কিছু নেই। ইংরাজ এইটি ধ্বংস করবার ফন্দী করে এবং ক্রমে মুসলমানদের আলাদা করবার চেষ্টা করে এবং তাতে সফলও হয়। এই চক্রান্তের ফলেই মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলমানে মারাত্মক দাংগা বাধত। এমনি সব বাধা অতিক্রম ক'রেও মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন।

প্রথমে তিনি নিজে আইন অমান্য করা স্থির করেন।

আমাদের দেশে লবণ তৈরি করা ইংরাজ সরকারের কাছে ভয়ানক বেআইনি কাজ। লবণের জন্য আমাদের কখনও বিদেশের দিকে চেয়ে থাকতে হ'ত না ইংরাজ-শাসনের পূর্বে। ইংরাজ সরকার ইংলণ্ড থেকে জাহাজ বোঝাই ক'রে লবণ এনে ভারতের বাজারে ছড়াতে লাগল। এই লবণ কাটাবার জন্য ইংরাজরা টেক্‌স বসালে দেশি লবণের ওপর। ফলে বিলিতি লবণের চেয়ে দেশি লবণের দাম হ'ল অনেক বেশি। কাজেই দেশি লবণের ব্যবসা একেবারে মাটি হ'য়ে গেল দেশি অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো।

এই লবণ ধনী থেকে ভিখিরি পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষেরই এত প্রয়োজনীয় যে, এ না হ'লে উপায় নেই; অথচ এই অপরিহার্য্য দ্রব্য নিয়ে ইংরাজ সরকারের যে ভয়ানক অন্যায় আইন আছে, সেইটিই আগে ভাঙা সব চেয়ে বেশি দরকার।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভংগ

করবার উদ্দেশ্যে সবরমতি আশ্রম থেকে অভিযান করেন উনআশি জন আশ্রমবাসীকে নিয়ে। সবরমতী থেকে তুই শত মাইল দূরে সমুদ্রের উপকূলে দণ্ডী। এই দীর্ঘ তুই শত মাইল পথ তিনি হেঁটে হেঁটে যান তুই পাশের শত শত পল্লীগ্রামের অগণিত নর-নারীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌বুদ্ধ ক'রে দিয়ে।

উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে সারা ভারত। সকল রকম আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় বাংলার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে।

বলা বাহুল্য যে, মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার ক'রে নেওয়া হ'ল জেলে। সংগে সংগে সারা ভারতেই শুরু হ'ল আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন। মহাত্মাজীর নির্দেশে বিপুল জনসাধারণ অটল, অচল, অহিংসই রইল। বাংলা দেশে শুরু হ'ল তোলপাড়। সামান্য লবণ সত্যাগ্রহ থেকে শুরু হ'ল সকল রকমের আইন অমান্য। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তকের অংশবিশেষ পাঠ ক'রে গ্রেপ্তার হলেন। চারদিকে আইন লংঘন ক'রে হাজার হাজার লোক শোভাযাত্রা করতে লাগল। ভোরবেলা রাস্তায় রাস্তায় প্রভাত ফেরী। বৃদ্ধ থেকে নিতান্ত বালকের হৃদয়েও খেলতে লাগল বিদ্যুৎ-শিহরণ। লবণ তৈরি বাদ গেল না কোথাও। লবণ সত্যাগ্রহে মেদিনীপুর আর মহিষাবাথানই প্রসিদ্ধি লাভ করে অন্য সব জায়গার চেয়ে বেশি। হাজার হাজার ছেলে-

ময়েকে দেখা গেছে নারিকেল গাছের বালদোগুলো পুড়িয়ে তার ছাই জলে ফেলে তলাকার জল পরিষ্কার ক'রে লবণ তৈরি করতে।

সারা বাংলা জুড়ে চলল পুলিশের লাঠি ও গুলি। বাংলার জেলখানায় হ'ল স্থানাভাব। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা কমল না কিছুতেই। প্রবল বেগে চলল বিলিতি দ্রব্য বর্জন, মদের দোকানে পিকেটিং, বেআইনি শোভাযাত্রা আর সভা। বাংলার প্রধান নেতৃবৃন্দরা আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন; সকল জেলারই উল্লেখযোগ্য দেশকর্মী কেউই বাদ গেলেন না। এর সংগেই শুরু হ'ল কর বন্ধ আন্দোলন। করবন্ধ বহু জায়গায়ই হয়েছিল বটে, কিন্তু এর সাফল্যের দিক দিয়ে মেদিনীপুর সব চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এক একটা থানার এলাকার গ্রাম-গুলো এক জোট হ'য়েই চৌকিদারী টেক্‌স বন্ধ করেছিল।

ইংরাজ সরকার টেক্‌স আদায়ের জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠল। দলে দলে সশস্ত্র পুলিশ বাড়ীতে ঢুকে মালপত্র বার ক'রে নিয়েছে, নষ্ট করেছে। পাঁচ টাকা টেক্‌সর জন্য পাঁচ শো টাকার জিনিস দিয়েছে তচ্‌নচ্‌ করে। এর ফলে অসংখ্য বাঙালী পরিবার হ'য়ে গেল সর্বস্বান্ত।

এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে, পুরুষদের সংগে সংগে নারীরাও অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে এসে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছেন, স্বাধীনতা লাভের আকাংক্ষা তাদের অন্তরে তখন এতই দুর্বার

হ'য়ে উঠেছে। লাঠি খাওয়া, গুলি খাওয়া, জেলে যাওয়া বাংলার নারীদের জীবনেও নিত্যকার ঘটনা হ'য়ে পড়ল। বাংলার সুদূর পল্লীগ্রামের নিতান্ত অশিক্ষিত পুরুষ এবং নারীও স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি।

সত্যাগ্রহের এই শক্তি দেখে ইংরাজ-শাসক পড়ল দুশ্চিন্তায়। বিলাতে ইংরাজ মন্ত্রীরা আর ভারতের ইংরাজ প্রতিনিধি দিল্লীতে বসে ভাবেন,—

"কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে।"

বিশ্বকবির ভাষায় তখন সত্যিই—
"হোথা বার বার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।"

ভারতের রাষ্ট্রপাল তখন লর্ড আরউইন। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন যে, ১৩ দফা নতুন আইন জারি ক'রে আর শত শত সংবাদ-পত্রের প্রকাশ বন্ধ ও তাদের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত ক'রেও কিছুই সুফল পাওয়া গেল না; অতএব একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করা দরকার।

কংগ্রেস-নেতাদের সংগে লর্ড আরউইনের কথাবার্তা শুরু

হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর সংগে লর্ড আরউইনের একটি চুক্তি হ'ল। এই চুক্তির নাম গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এতে স্থির হ'ল এই যে, সমুদ্রতীরে যারা বাস করে তারা লবণ তৈরি করতে পারবে অবাধে, আন্দোলনে বন্দী হয়েছেন যাঁরা তাঁদের মুক্তি দিতে হবে; কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনও মহাত্মাজীকে বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

আইন অমান্য বন্ধ হ'ল, কিন্তু সব রাজবন্দী মুক্তি পেলেন না। হিংসাত্মক কোন কাজের অভিযোগ পুলিশ যাঁদের বিরুদ্ধে এনেছিল তাঁরা মুক্তি পেলেন না। যাদের উপর জোর জুলুম ক'রে কর আদায় করতে গিয়ে পুলিশ সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, তারাও তা ফেরত পেল না। তা ছাড়া এই চুক্তি লর্ড আরউইন করেছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে, ভারত সরকার তো আর করেন নি।

এতে বহু নেতা অত্যন্ত দুঃখিত হন। বিশেষ ক'রে দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র। তাঁর মতে ইংরাজের সংগে রফা করবার জন্য আন্দোলন বন্ধ করা এবং রাজনীতির খেলায় বারে বারে ইংরাজকে জেতবার সুযোগ দেওয়া দুর্বলতা।

ভারতবাসীকে আইনত অধিকার দেওয়ার জন্য ইংরাজ সরকার এক গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন; কিন্তু তাতে বড়লাট সাহেব নিজের মনের মতো কয়েকজন ভারত-বাসীকে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য পাঠান। কংগ্রেস তাতে

যোগ দিতে রাজি হয়নি। সরকারের মনোনীত এই ভদ্র-লোকদের ওপর জনগণের কোন আস্থাই ছিল না। কাজেই শেষটায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হ'ল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন হ'ল। কংগ্রেস যোগ দিতে রাজী হ'ল এবং মহাত্মা গান্ধীকে প্রতিনিধি ক'রে পাঠাল। মহাত্মাজী ইংলণ্ডে গেলেন এবং ভারতের পক্ষ থেকে দাবী জানালেন, ভারতের অবস্থা ভাল ক'রেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন ইংরাজ-জাতিকে; কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নার সংগে বোঝাপড়া কিছুতেই হ'ল না। জিন্নার মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগ দিতে রাজী নয়। চৌদ্দ দফা অদ্ভুত দাবীর এক বর্ণও অদল-বদল করতে প্রস্তুত নয়। সকল বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাই নানা রকমে বুঝতে পারলেন যে, এটাও ইংরাজেরই চক্রান্ত।

হতাশ হ'য়ে মহাত্মাজী ফিরে এলেন ভারতে।

যে মানুষটি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় ক'রে, পূর্ণ অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় ক'রে, ইংরাজের প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ না ক'রে ইংরাজের অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করবার ব্রত গ্রহণ করে-ছিলেন, সেই বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা গান্ধীর যুক্তিও ইংরাজ-শাসকের হৃদয় স্পর্শ করেনি। ক্ষমতামত্ত সবল কোন দিনই যুক্তির ধার ধারে না। ইংরাজও ন্যায়ের পথে, যুক্তির পথে গেল না।

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব

অসহযোগ আন্দোলনের গতি মধ্যপথে রুদ্ধ হওয়ায় অনেকে হতাশ হয়েছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনও স্তব্ধ হওয়ায় তরুণ বাংলা খুব খুশী হ'তে পারলে না। তা ছাড়া বিপ্লববাদীরা কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিলেও, সকল রকমে এই আন্দোলনের শক্তি-বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করলেও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন না যে, একতরফা মার খাওয়াতেই ইংরাজের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে।

এই জন্যই যোগেশ চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র সান্ন্যাল প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কেরা আবার বিপ্লবী দল সংগঠনে মন দিলেন। গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্ব বাংলা দেশে সব সময়েই ছিল। অসহ-যোগের যুগে এর প্রচেষ্টা ছিল খুবই কম, শুধু মাঝে মাঝে এখানে সেখানে ইংরাজ বা অত্যাচারী দেশি রাজকর্মীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে এই পর্যন্ত।

এবার নির্বাপিত-প্রায় আগুন জ্বলে উঠল আবার। বাংলার নানা জায়গার নিস্তেজ বিপ্লবী সংস্থাকে আবার জীবন্ত ক'রে তোলবার জন্য আগেকার বিপ্লবী কর্মীরা সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এর ফলে বিপ্লবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল এবং বিপ্লবী সংস্থা ছড়িয়ে পড়ল বাংলার বাইরেও বহু জায়গায়।

এই সময়েই একটা ঘটনা ঘটে।

লক্ষ্ণৌ-সাহারানপুর রেলপথে কাকোরী নামে একটি ষ্টেশন

আছে। রাত্তিরে একদিন খুব জোর হাওয়া আর বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত বেশি। এই দুর্যোগের সময়েই মেল ট্রেণ এলো ষ্টেশনে। দুর্যোগে ষ্টেশনে ভীড় অত্যন্ত কম। একটু পরেই ট্রেণ দিলে ছেড়ে। অমনি চেনে পড়ল টান। গাড়ী গেল থেমে। কয়েকটি যুবক ট্রেণ থেকে নেমেই গার্ড ও ড্রাইভারের বুকের সামনে পিস্তল ধ'রে দাঁড়াল। দেখতে না দেখতেই মেল্-ভ্যানের টাকার সব থলিগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

মাস খানেকের মধ্যেও পুলিশ কাউকেই ধরতে পারলে না বটে ; কিন্তু এই ঘটনা যে বিপ্লবীদের দ্বারা হয়েছে এর প্রমাণ পেলে। সুতরাং অনেককে গ্রেপ্তার ক'রে একটি ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করলে।

এর একটু পরেই দক্ষিণেশ্বরে একটা বোমার কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করে। এই কারখানার সংগে বিপ্লবীদের বিশেষ সংযোগ রয়েছে মনে ক'রে পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করে কলিকাতায়, বহরমপুর, কাশী, এলাহাবাদে এবং লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, কানপুরে। এই সব বন্দীদের মুখ থেকে গুপ্ত তথ্য জানবার চেষ্টা করে নামকরা গোয়েন্দা পুলিশ রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চাটুজ্যে। একদিন সুযোগ বুঝে বিপ্লবীরা তাঁকে লোহার দাণ্ডা দিয়ে খুন করে। এই খুনের অপরাধে অনন্ত-হরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসি হ'ল।

গোয়েন্দা পুলিশ বহু রকমের অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করল

যে, কাকোরীর ঘটনা, বোমার কারখানা, গোয়েন্দা পুলিশ খুন ইত্যাদি নানা জায়গার ঘটনার মূলে একটা বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানই কাজ করছে ভারত জুড়ে। বিপ্লববাদ ব্যাপক হ'য়ে পড়েছে। পুলিশের ধারণা অমূলক নয়।

কাকোরীর ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বহু বিপ্লবী বন্দীর বিচার হ'ল। অনেক দিন ধ'রে বিচারের পর রাজেন লাহিড়ী, রোশন শিং, রামপ্রসাদ বিসমিল ও আস্‌ফাক্ উল্লার ফাঁসি হ'ল, শচীন সান্ন্যালের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, মন্মথ গুপ্তের ১৪ বছর এবং যোগেশ চাটুজ্জের ১০ বছর জেল।

"বাংলা ও বাংলার বাইরের বহু বিপ্লবী তরুণ তখন কারাগারে আবদ্ধ, তবু তাদের তৎপরতা একটুও শ্লথ হয়নি। বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লী পরিষদ-গৃহে অধিবেশন চলার সময়ে একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। মামলায় তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁদেরকে এবং শুকদেব, যতীন্দ্রনাথ দাস, রাজগুরু প্রভৃতি বিশিষ্ট বিপ্লবীকে জড়িয়ে পুলিশ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এই সব বিপ্লবী তরুণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অনেক। এর মধ্যে লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্যাণ্ডার্স্‌কে হত্যা করার অভিযোগও ছিল। হাজতে ও আদালতে এঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় ব'লে তাঁরা অনশন আরম্ভ করেন। ৬৪ দিন উপবাসের পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বাংলার দামাল ছেলে শ্রেষ্ঠ

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। সাম্রাজ্য-বাদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এমন অপূর্বতায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। ভারতের ইতিহাসে এই দধীচির মৃত্যুবরণ অভিনব।"*

কলকাতা মেছুয়াবাজার থেকেও পুলিশ একটা বোমার কারখানা আবিষ্কার করে, বহু লোককে গ্রেপ্তার করে বিচার হয়, কতকের হয় দ্বীপান্তর আর কতকের হয় কারাবাস।

এর পরেই বাংলার প্রান্তে ক্ষুদ্র-পাহাড়-মণ্ডিত, সাগর-সেবিত চট্টগ্রামের বুকে এক রাত্তিরে অকস্মাৎ দেখা দিল বিপ্লবের প্রলয়-বহ্নি।

দেশের ডাকে চাটগাঁ কখনও পেছিয়ে থাকেনি। কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলনেই বীরভূমি চট্টলা ঝাঁপ দিয়েছে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে।

কি বংগ-ভংগ আন্দোলনে, কি অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ সংগ্রামে চট্টলা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। তার মধ্যে এই জীবন-পণ ছিল ব'লেই সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায়ও তার তুলনা অত্যন্ত বিরল।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সরকারই বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়েছে বার বার। ১৯১৬ সালে ভারত রক্ষা আইনের কবলে তিন হাজার কর্মী কারারুদ্ধ ও অন্তরীণে আবদ্ধ হয়।

---

* মহাজাতি—নেতাজী সংখ্যা, ১৩৫৬ সাল, পৃষ্ঠা ১১

দেশব্যাপী অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এতে। যদি যুবকেরা অন্যায়ই ক'রে থাকে, তাদের বিচার হ'তে পারত। বিনা বিচারে জেলে রাখায় জনগণ সন্তুষ্ট হয় না, হ'তেও পারে না। কিন্তু সরকার জনগণের কথায় কান দেয়নি। সরকারের কাছে জনসাধারণ কথাটার অর্থ হচ্ছে তারা নিজেরা এবং তাদের দলের লোকেরা।

এর পরে যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটল এবং সারা পাঞ্জাব জুড়ে ইংরাজের পৈশাচিকতা দেখা দিল, তখন তরুণ বাংলার বহু কর্মীই বিপ্লবের পথই একমাত্র পথ ব'লে ধ'রে নিলেন। চট্টগ্রামেও এই সময়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এমন একটি মানুষের নেতৃত্বে যাঁর তুলনা বিরল এবং যাঁর কৃতকর্মতার জন্য শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতই গৌরব বোধ করবে চিরকাল।

ইনি সূর্য সেন। শিক্ষক হিসাবে ইনি ছাত্র সমাজের মাষ্টারদা'। আজ তিনি সারা বাংলায়, তথা সারা ভারতেই মাষ্টারদা' নামেই খ্যাত এবং পূজিত।

অসহযোগের প্রচণ্ড ঝড় সারা দেশে তোলপাড় তুলেছে যখন, বিপ্লবী সূর্য সেন তাঁর সকল শক্তিশালী অনুচর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই ঝড়ে। কিন্তু ঝড়ের গতি হঠাৎ রুদ্ধ হওয়ায় এবার তাঁকে আবার সেই আগেকার পথের কথাই ভাবতে হ'ল। দেশের ডাক যাদের ঘরছাড়া ক'রে টেনে এনেছে, তারা আবার ঘরের কোণে ফিরে গিয়ে ব'সে থাকতে

রাজী নয়। কারণ তারা মনে করেছিল যে, মুক্তির পথে বেরিয়ে মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত ফিরে আসা যায় না। মুক্তি রইল কোথায়, অথচ পথ ছেড়ে ফিরে আসতে হবে, এ যেন তাঁদের কাছে অত্যন্ত বেখাপ্পা ব'লে মনে হ'ল। তারা মুক্তি-সাধক, সুতরাং মুক্তি না আসা পর্যন্ত তারা একটুও আরাম চায় না।

অসহযোগ আন্দোলনে যে বিপ্লবী প্রয়াস কিছুদিনের জন্য চাপা পড়েছিল তা আবার শুরু হয়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি সেদিনের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রেখে মাষ্টারদা' বিপ্লবী সংস্থার সংগঠনে মন দেন।

কংগ্রেস-সেবক হিসাবে চাটগাঁ জেলায় মাষ্টারদা'র প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। একদিকে শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তীর সহায়তায় কংগ্রেসের কর্মপ্রসারে, আর একদিকে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অনুরূপ সেন ও নির্মল সেন পরম আগ্রহের সহিত মাষ্টারদা'র সংগে যুক্ত হন এই কাজে।

চট্টগ্রামের সর্বত্র বিপ্লবীসংস্থা গ'ড়ে উঠতে লাগল খুব দ্রুত। বাংলার যে দুইটি বিখ্যাত বিপ্লবী দল ছিল,—অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল, তাঁদের বহু স্থানীয় কর্মীই ছিলেন এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। যুগান্তর দলের নেতা ডাঃ ভূপেন দত্ত ১৯২২ সালে চাটগাঁতে যান চারুচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে। তাঁরা

সূর্য্য সেন

কিছুদিন বাস করেন সূর্য সেনের সংগে। কলকাতা এবং বাংলার সকল বিশিষ্ট বিপ্লবী সংস্থার সংগেই চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের যোগ ছিল।

সূর্য সেনের ডানহাত ছিলেন নির্মল সেন। ভূপেন দত্ত, চারু ঘোষ, সূর্য সেন ও নির্মল সেন পরামর্শ ক'রে শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তীকে আকিয়াব থেকে এনে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে চাটগাঁয়ে বসিয়ে দেন।

বাংলার যে-সব বিপ্লবী নেতা চাটগাঁয়ে এসে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীসুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ থেকে সর্বস্বত্যাগী ঋষিকল্প অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষও ছিলেন।

বালেশ্বরে বাঘা যতীন যে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, এঁদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই ভারতব্যাপী রক্তে-রাঙা বিপ্লবের পথ। সে পথ চলেছে সামনে, সামনে কত অসংখ্য বাঁকে পাক খেয়ে। যাত্রা সবে শুরু।

মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে দলে দলে বিপ্লবী দেশের মুক্তির জন্য মৃত্যু পণ করে। 'যুগান্তরের' প্রকাশিত সংগীত তাদের শক্তি দেয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে ঃ—

"আয় আজি আয় মরিবি কে ?

জরার মতন না লভি মরণ

সাধকের মত মরিবি কে ?

পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির, নিশীথ শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?
অসুর-নিধনে কিসের তরাস ? পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে ?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসি মুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্ন তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন
তাদেরই অংশে তাদেরই বংশে জনম সে কথা স্মরিবি কে ?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পূর্ণ আর্যের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশগৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?"

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেছে। তখন দেশের অন্তঃস্তলে ইংরাজ-বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত, বিপ্লববহ্নি ধূমায়মান। ইংরাজকে আঘাত হানবার এইটিই উত্তম সুযোগ ব'লে স্থির করলেন মাষ্টারদা'।

বিপ্লবী দলের সকলের সম্মতি নিয়ে তিনি স্থির করলেন এই কর্মতালিকা ঃ—

১। নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (এইখানে

সরকারী রিজার্ভ বাহিনীর ব্যারাক ও সমস্ত অস্ত্র সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল)।

২। রেলওয়ে অক্‌সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (এখানে এই বাহিনীর ব্যারাক ও রাইফেল, লুইস্‌গান, রিভলভার, পিস্তল এবং গোলা-গুলির বিপুল সঞ্চয় ছিল)।

৩। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন্ এক্‌স্‌চেঞ্জ অফিস আক্রমণ ও ধ্বংস-সাধন। (রেলপথ তুলে দিয়ে বাইরের সংগে যোগাযোগ ছিন্ন ক'রে দেওয়া)।

৪। ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণ।

৫। সরকারী ট্রেজারী আক্রমণ।

৬। জেলখানা আক্রমণ, কয়েদীদের মুক্তি দান এবং তাদের কাজে লাগানো।

৭। শহরের বন্দুকের দোকানগুলি লুণ্ঠন।

৮। ইংরাজের গোঁড়া সমর্থকদের শাস্তিবিধান।

সূর্য সেন কংগ্রেসের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনকে আরো জোরালো করবার উদ্দেশ্যেই সশস্ত্র আইন অমান্যের জন্য বিপ্লবী দলকে প্রস্তুত করলেন। জাগ্রত, বিক্ষুব্ধ জনগণের ওপর হিংসা ও অহিংসার চুলচেরা বিচার সাধারণত কোন প্রভাব বিস্তার করে না। শৃংখল ভাঙাটাই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে কি ভাবে ভাঙা হবে তা নিয়ে চুলচেরা বিচার না করলেই বা ক্ষতি কি? মাষ্টারদা' এগিয়ে চললেন এই বিশ্বাস নিয়েই।

শত শত বিশ্বস্ত অনুবর্তী বিপ্লবী কর্মীদের মধ্য থেকে মাষ্টারদা' বাছাই ক'রে ৬২ জনের নামের একটি তালিকা তৈরি করলেন। এদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে দলের সকলের সম্মতি নিয়ে নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য এই ছয় জনের ওপর ভার দিলেন কার্যসূচী অনুসারে কাজ চালাবার জন্য; এক কথায় সর্বাধিনায়কের অধীনে এই ছয় জন নির্বাচিত হলেন বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন তাঁর এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন—Indian Republican Army অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল।

এই ১৮ই এপ্রিল দিনটিতে আয়ার্ল্যাণ্ডে যে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল ইংলণ্ডের লৌহ-শাসন থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে, তা ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে ঈষ্টার বিদ্রোহ নামে। সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা' এই জন্যই এই দিনটিই আক্রমণের জন্য স্থির করলেন।

মাষ্টারদা'র নির্দেশে নির্বাচিত নায়কগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হলেন এবং সব রকমে প্রস্তুত হ'য়ে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় রইলেন।

ব্যস্ততার মধ্যে দিন শেষ হ'য়ে গেল, রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো চাটগাঁর বুকে।

বিপ্লবী বীর লোকনাথ বল তাঁর বাড়ী থেকে নির্দিষ্ট সময়ে মোটরে ক'রে বেরিয়ে গেলেন আটজন সৈনিক-বেশে সজ্জিত বিপ্লবী নিয়ে। তিনি আক্রমণ করলেন চাটগাঁ শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার। পাহারা-ওয়ালারা রুখে দাঁড়াতেই বিপ্লবীরা গুলি চালায়। মুহূর্ত-মধ্যেই পাহারাওয়ালার দল পালিয়ে গেল। ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সার্জেণ্ট্ মেজর ফ্যারেল রিভলভার তুললেন। তাঁকে বিপ্লবীরা বারণ করলেন গুলি ছুঁড়তে, কিন্তু নিষেধ না শুনে তিনি যেমনি গুলি করতে উদ্যত হলেন, অমনি তিনি প'ড়ে গেলেন মাটিতে বিপ্লবীদের গুলিতে।

রেলওয়ে অস্ত্রাগার লুট করলেন বিপ্লবীরা।

বীর অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষও তাঁদের দলবল নিয়ে মোটর ভাড়া ক'রে বেরিয়ে গেলেন এবং ঠিক একই সময়ে, অর্থাৎ ৯-৪৫ মিনিটেই আক্রমণ করলেন পুলিশ অস্ত্রাগার। সামরিক পোষাক-পরা বিপ্লবীরা গাড়ী থেকে নেমেই গুলি চালাতে শুরু করেন। একজন প্রহরী আহত হ'য়ে প'ড়ে যেতেই বাকী সব পালিয়ে গেল। এখানে থাকত পাঁচশো পুলিশ, কিন্তু হঠাৎ মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে এই পাঁচ-পাঁচ শো পুলিশ যে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হ'ল, তা আর জানতে পারা গেল না। পুলিশ অস্ত্রাগার এলো বিপ্লবীদের দখলে।

ঠিক ৯-৪৫ মিনিটেই অম্বিকা চক্রবর্তী তাঁর দলবল নিয়ে

আক্রমণ করেন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন্ এক্স্চেঞ্জ। এখানেও ঐ গুলির ভয়েই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ এবং অপারেটার্ প্রভৃতি পালিয়ে যায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

এদিকে চাটগাঁয়ে যাতে সেপাই আনতে না পারা যায়, সেই জন্য ধূম ও লাংগলকোটের কাছে একদল বিপ্লবী তুলে ফেলে রেল লাইন ঐ একই সময়ে।

নির্দিষ্ট কাজ শেষ ক'রে প্রত্যেকটি দল এসে সমবেত হ'ল পুলিশ অস্ত্রাগারে। ঘন ঘন "বন্দে মাতরম্" ও "ইন্‌ক্লাব-জিন্দাবাদ্" ধ্বনির মধ্যে সেখানেই সাময়িক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার গঠিত হ'ল এবং সূর্য সেনই নির্বাচিত হলেন তার সর্বাধিনায়ক।

রাত দুটোর সময়ে অস্ত্রাগারের সামনে ওয়াটার্ ওয়ার্কস্ থেকে পুলিশ মেশিন-গান ছুঁড়তে থাকে। বিপ্লবীরা পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে আগুন লাগিয়ে স'রে পড়েন সেখান থেকে।

সকালবেলা এদিকে যেমন শহরবাসীদের মধ্যে এই আক্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা চলতে লাগল, তেমনি আর এক দিকে শহর ও শহরতলীর সাহেব-মেমদের মধ্যে দেখা দিল ভয়ানক আতংক। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাদের সকলকে নিয়ে জাহাজে নদীর মাঝখানে গিয়ে নোঙর ফেলে রইলেন। তিন দিন সারা চট্টগ্রামে ইংরাজের কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

বিপ্লবীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে।

২২শে এপ্রিল গোরাসৈন্য এসে আক্রমণ করে সেই পাহাড় চারদিক থেকে। মাষ্টারদা' স্থির করলেন, এইখানেই ইংরাজ-ফৌজের সংগে যুদ্ধ করতে হবে, অন্য কোন পথ নেই। তাঁরই নির্দেশে লোকনাথের সেনাপতিত্বে শুরু হ'ল লড়াই। উভয় পক্ষেই গুলি বিনিময় চলে সমস্ত দিন। বিপ্লবী দলের বার জন নিহত হলেন, কিন্তু ইংরাজ-সৈন্য নিহত ও আহত হ'ল একশো পঞ্চাশ জন। জালালাবাদের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় বাঙালী তরুণ বিপ্লবীর যে কৌশল, যে বীরত্ব, যে দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিপুল-শক্তি ইংরাজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে তা সত্যই অতুলনীয়। এই যুদ্ধে নিহত বিপ্লবী নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরি বল (টেগ্‌রা), মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাংক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, অর্ধেন্দু দস্তিদার—সকলেই ছাত্র, বালক মাত্র। লোকনাথের ছোট ভাই হরি বলের (টেগ্‌রা) বয়স তখন ১৪ বছর মাত্র।

রাত্তিরের অন্ধকারে সৈনিকের বেষ্টনী ভেদ ক'রে বিপ্লবীরা জালালাবাদ থেকে বেরিয়ে আত্মগোপন করেন। একটানা তিন দিন তিন রাত বিপ্লবীদের পেটে পড়েনি এক কণা খাদ্য, মুখে পড়েনি এক ফোঁটা জল। বিশ্রাম ও ঘুম তো তারা ভুলেই গেছে। কী দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্য দিয়েই

যে তাদের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুধু এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে, কিসের প্রেরণায় আর কাদের কল্যাণের জন্য তাঁদের এই তিলে তিলে আত্মাহুতি ?

এই অবস্থায়ই তাঁরা অদৃশ্য হ'য়ে যান চারদিকে।

মাষ্টারদা' মুক্তি-সাধক, তাই আত্মগোপন ক'রেও দলের ছিন্ন-সূত্রের যোগসাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন কয়েকজন বিপ্লবী নায়ককে সংগে নিয়েই। সংগে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের নামেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। তাঁদের ধরবার জন্যে সকল গ্রামবাসীকেই পুলিশ টাকার লোভ দেখিয়েছে। সর্বত্র ইংরাজের কী সতর্কতা, কী কৌশলভরা পাহারা !

মরুভূমির মাঝখানে মরূদ্যানের মতো মাঝে মাঝে তাঁদের জোটে এমন দু'এক জন মা যাঁরা মাষ্টারদা'র মতো ঘর-ছাড়া শত সন্তানের জননী, যাঁরা হাসিমুখে নির্ভয়ে অগ্নি-অভিযানের সূচী রচনায় প্রাণপূর্ণ সাহচর্য দান করেছেন। বিপ্লবী রজত সেনের জননী বিনোদিনী দেবী এবং সাবিত্রী দেবীর মতো মায়েরাই এই বিপ্লবী দলকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে এবং বিপ্লবী কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে সাহায্য করেছেন সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য ক'রেও।

৫ই মে রজতকুমার, মনোরঞ্জন সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী—এই ছয়জন

পলাতক বিপ্লবী চট্টগ্রাম শহরের নিকটস্থ শ্বেতাংগ মহল আক্রমণের উদ্দেশ্যে অভিযান করে। কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন, সুতরাং আক্রমণ অসম্ভব। ফিরে যায় তারা রজতের বাড়ীতে। শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে অবসন্ন ছেলেদের জন্য খাবার তৈরি ক'রে মা তাদের ডাকলেন। এমন সময়েই খবর এলো পুলিশ আসছে।

বাড়া ভাত প'ড়ে রইল। বিপ্লবী ছয় জন পালিয়ে গেল নদীর দিকে।

তারা ছয়জনে কর্ণফুলী নদী পার হ'বার জন্য নৌকোয় চেপেছে। পুলিশ টাকার লোভ দেখিয়ে বহু লোককেই বশ ক'রে রেখেছিল। গুপ্ত খবর পেয়েই পুলিশ ছুটল লঞ্চে। নৌকো এসে পৌঁছাল কালারপোল নামক গ্রামে। সন্ধানী-আলো ফেলে পুলিশ দেখতে পেলে, নৌকো থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছয়জন যুবক দৌড়ুচ্ছে। গ্রামবাসীরা অনেকে তাদের ধরতে আসে। এরা গুলি ক'রে পালায়। তারপর কালার-পোলের বাসিন্দা মুসলমানেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসে। এই গ্রামবাসীদের সংগে এসে যোগ দেয় তিন দল পুলিশ। অনেক পুলিশকে গুলি ক'রে এরা পালিয়ে যায়, কিন্তু সুবোধ চৌধুরী ও মণীন্দ্র নন্দী গুলিতে আহত হ'য়ে ধরা পড়ে।

বাকী চারজন তিন দিনের উপবাস শীর্ণ দুর্বল দেহ টেনে নিয়ে কোন রকমে আত্মগোপন করে শণের বনে।

রাত কাটল। ভোরবেলা শণের ক্ষেত ঘিরে ফেললে অসংখ্য পুলিশ। একদিকে চারজন বালক, আর একদিকে শত শত পুলিশ ও গ্রামবাসী।

হুকুম হ'ল—আত্মসমর্পণ কর।

বিদ্রোহীরা জবাব দিলে গুলি চালিয়ে। শুরু হ'ল লড়াই, যেমনি শুরু হয়েছিল বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীনের সংগীদের লড়াই টেগার্টের বাহিনীর সংগে। লড়াই করতে করতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল রজত সেন, স্বদেশ রায়, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন।

এর পর পুলিশ আর মিলিটারির তাণ্ডবে সারা চাটগাঁ জেলার পাঁজর যেন ভেঙে যেতে লাগল। জেলার সকল জায়গায় পুলিশ ফাঁড়ি আর মিলিটারির অসংখ্য ঘাঁটি বসল। সর্বত্রই কিল, চড়, লাথি, লাঠি আর সংগীনের খোঁচা চলল বেপরোয়া ভাবে সকল শ্রেণীর ছাত্রদের ওপর, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের ওপর। অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতিকে বা'র করবার এই পথই খুঁজে বা'র করেছে ইংরাজ। এঁদের না পাওয়া অবধি চাটগাঁ ছারখার করাই উদ্দেশ্য ছিল কর্তৃপক্ষের।

এদিকে অনন্ত সিং চ'লে গেছেন কলকাতায় পুলিশের হাজার হাজার চোখে ধূলো দিয়ে। তিনি ধরা না পড়ায় সারা জেলায় যে পৈশাচিক অত্যাচার চলছে, তা নিতান্ত

অসহ্য হওয়ায় অনন্ত সিং বাংলার পুলিশ-কর্তাদের কাছে চিঠি লিখে থানায় গিয়ে নিজের নামলেখা কাগজখানি থানার কর্তার সামনে ধ'রে বললেন,—আমিই বিপ্লবী অনন্তলাল সিং।

বিনামেঘে হঠাৎ বজ্রপাত হ'লে যে অবস্থা হয়, এই পুলিশ-কর্তাটির অবস্থাও হ'ল ঠিক তাই। চমকে গিয়ে সে ঢুকল টেবিলের নীচে। তারপর সুস্থ হ'য়ে সে গ্রেপ্তার করে অনন্ত সিংকে।

বিপ্লবী দলের কাজেই অনন্ত, লোকনাথ, গণেশ, জীবন ও আনন্দ কলকাতায় এসে রয়েছেন যুগান্তর দলের আশ্রয়ে। এঁদের মধ্যে অনন্ত সিং পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছেন। যুগান্তর দলের শশধর আচার্যের ব্যবস্থায় গোন্দলপাড়ায় সুহাসিনী গাংগুলির আশ্রয়ে একটি বাড়ীতে এঁরা এসে থাকেন।

এই খবর অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশের কানে যায়। টেগার্ট, বার্টলী ও ম্যাকেন্টি সাহেব এবং দশ জন বিশেষ বিশেষ পুলিশ কর্মচারী পুলিশ ও মিলিটারি নিয়ে মোটরে ক'রে রাত্তির ৩টার সময়ে গিয়ে সেই বাড়ীটি ঘিরে ফেলে। বিপ্লবী যুবকেরা টের পেয়ে পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে পুলিশের নজরে পড়ে। পুলিশ গুলি চালায়, এঁরাও জবাব দেয় গুলি ক'রেই। জীবন ঘোষাল গুলি খেয়ে মারা গেলেন,

আর লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাংগুলি ধরা পড়লেন।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা'র হ'য়ে আছে বহু কর্মীর নামেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এবার চেষ্টা করতে লাগল সূর্য সেন, নির্মল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে বা'র করতে। তারা মনে করেছে এই তিনজনকে ধরতে পারলেই বিপ্লবী দলের প্রাণ-শক্তি হ্রাস হবে। ত্রিশ জনেরও বেশি বন্দী চট্টগ্রাম জেলে আছে, তাদের বিচার হবে; এখন সূর্য সেন আর তাঁর সকল কাজের সহচর নির্মল সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ধ'রে আনতে পারলেই বাইরের বিপ্লবীদের কাজে লাগবার শক্তি ও কৌশল আর কার থাকবে?

এদিকে সূর্য সেন তাঁর সহকারী বিপ্লবীদের সংগে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন যে, কোর্ট বিল্ডিংয়ের যেখানটায় বিচারকদের নিয়ে গাড়ীগুলি রোজ এসে দাঁড়ায়, সেখানটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে গাড়ীসহ বিচারকদের ধ্বংস-সাধন করতে হবে। কিন্তু পুলিশ কি রকম ক'রে এই ষড়যন্ত্র টের পেল এবং মাটি খুঁড়ে বোমা, ডিনামাইট, তার ইত্যাদি বা'র করল।

চট্টগ্রামে গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা আসানুল্লার অত্যাচার সকলকে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। তাঁর নামেই সকলের বুক কেঁপে ওঠে এমনি ভয়ংকর লোক সে। একদিন ফুটবল খেলার মাঠে পুরস্কার বিতরণের পর রক্ষী-পরিবেষ্টিত

হ'য়ে আসানুল্লা বেরিয়ে আসছেন, অমনি তাঁর বুকে গুলি চালালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সের হরিপদ ভট্টাচার্য নামে একটি ছেলে। আসানুল্লা নিহত হওয়ায় চারদিকে হুলস্থুল প'ড়ে গেল।

"গ্রেপ্তারের পর হইতে বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের উপর চরম নিগ্রহ চলিল। প্রত্যেকটি নখের ভিতর দিয়া সূচ ফুটাইয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে স্বীকার-উক্তি আদায়ের চেষ্টা হইল। ······পুলিশের নির্যাতন হইয়া উঠিল সীমাহীন ও অমানুষিক। সূচপর্ব শেষ করিয়া এইবার ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারীর আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। দিনের পর দিন রকমারী অত্যাচারের জ্বলন্ত কটাহে কিশোর বালক দুঃসহ যাতনা সহিয়াছে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথা কহে নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণঘরের সন্তান অপরিণত-বয়স্ক বালক হরিপদ কি অতুলনীয় আত্মিক শক্তিবলে নিপীড়নের চরম পরীক্ষার মধ্যেও নিজের আদর্শকে অমলিন রাখিল। স্মরণকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।······ চারি শতাধিক পুলিশ ও মিলিটারীর এক বাহিনী হরিপদকে পুরোভাগে রাখিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাটে ঘাটে পথে ইহারা উপস্থিত হয়—কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা অবশ্যই ভীড় করে। ইহাদের সামনে হরিপদকে বেদম প্রহার করা হয়। পুলিশের লোক তাহাকে আদেশ করে—'বল ইংরাজের জয় হউক, সূর্য সেনের দলের ক্ষয় হউক।' হরিপদ দৃপ্তকণ্ঠে ঠিক তাহার বিপরীত ধ্বনি দিয়া

বলে,—'বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হোক্, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, মাষ্টার-দা'র জয় হোক।' ধ্বনি ও প্রহার সংগে সংগেই চলিতে থাকে, সরোয়াতলীতে এই জয়ধ্বনি দেওয়ায় পুলিশের সংগীনের খোঁচায় তাহার চোখের কোণ বাহিয়া প্রচুর রক্ত পতিত হয়। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হরিপদর চোখ-মুখ অস্বাভাবিক ভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া বর্বরোচিত পীড়নের ইতিহাস রচিয়া চলিল গ্রামের পথে এই দুর্ধর্ষ সরকার বাহিনী। ইহারা গ্রামের সংখ্যাতীত বাড়ীতে ঢুকিয়া নির্বিচারে স্ত্রী পুরুষ শিশুর উপর অকথ্য পীড়ন চালাইয়াছে। বহু গৃহস্থের আসবাব-পত্র ধ্বংস করিয়াছে, গরীবের ঘরের থালা-বাটিও ইহাদের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। ইহার পর অনেক সন্দেহজনক বা পলাতক আসামীর বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছে। গ্রামের পথে এই অত্যাচারী বাহিনী প্রেরণ করিয়া সেদিন জেলার কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। সহরের সর্বত্র পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী সহরের মুসলমান গুণ্ডার দলকে লইয়া সর্বত্র লুণ্ঠন ও অত্যাচারের অভিযান চালাইয়াছে। এই সময় কত মেয়ের কৌমার্য, কত নারীর নারীত্ব, কত গৃহের মর্যাদা, কত গৃহস্থের সম্পদ, কত ব্যবসায়ীর পণ্য নির্বিচারে লুণ্ঠিত হইল, সে ইতিহাস লিখিয়া শেষ করা যায় না।"*

---

* শ্রীচারুবিকাশ দত্ত-প্রণীত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।" পৃষ্ঠা ২১৭—২১৯।

কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট য়্যালিসন্ সাহেবের অত্যাচার উঠল চরমে। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের বিনোদ দত্ত কুমিল্লায় গিয়ে অত্যাচারীকে হত্যার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁরই সহকর্মী শৈলেশ রায় য়্যালিসন্‌কে হত্যা ক'রে পালিয়ে যায়।

চাটগাঁয়েরই পলাতক বিপ্লবী কয়েকজন ঢাকায় যায়, সেখানেও অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন মৃত্যু-বিজয়ী যুবক একজোটে প্রস্তুত হয়। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণো সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। ডুর্ণো বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হন।

ঢাকায় ইন্‌স্‌পেক্‌টার্ জেনারেল্ লোম্যান্ সাহেবকে গুলি ক'রে খুন করে বিনয় বসু। লোম্যানের জায়গায় আসেন ক্রেগ্। চাঁদপুরে এই ক্রেগ্‌কে মারতে গিয়ে বিপ্লবীরা মেরে ফেলে পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্‌টার তারিণী মুখুজ্যেকে। এতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের হ'ল ফাঁসি, আর কালীপদ চক্রবর্তীর হ'ল দ্বীপান্তর।

চাটগাঁয়ের বিপ্লবী দলে যে শুধু প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ও কল্পনা দত্ত ছিলেন তা নয়, তাঁদের মতো সর্বস্বত্যাগিনী ও অপূর্ব তেজস্বিনী নারী যে আরও আছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টীভান্‌স্‌কে গুলি ক'রে মারলেন।

সারা বাংলাদেশেই তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে এখানে-

সেখানে। বহু জায়গায়ই বিপ্লবীরা দলবদ্ধ হয় এবং বহু গোয়েন্দা কর্মচারী এবং দেশি ও বিলিতি কর্মচারী নিহত হয়।

মেদিনীপুরেও বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। মেদিনীপুরের খেলার মাঠে দু'জন ছাত্র বার্জ সাহেবকে গুলি ক'রে খুন করে। সাহেবের দেহরক্ষীও গুলি ক'রে দুটি ছেলেকে খুন করে। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষের এই সম্পর্কে ফাঁসি হয় এবং আরো পাঁচ জনের দ্বীপান্তর হয়।

এর পরেই মেদিনীপুরে পেডী সাহেব খুন হন এবং এর পরই খুন হন ডগলাস্ সাহেব। এই সম্পর্কে প্রদ্যোৎকুমার ঘোষের ফাঁসি হয়। মেদিনীপুরে এমনি ক'রে পর পর তিন জন ম্যাজিস্ট্রেট খুন হন।

কলকাতায় রাইটার্স্ বিল্ডিংএ অফিস-ঘরে বসা জেলের ইন্‌স্‌পেক্‌টার জেনারেলকে দীনেশ গুপ্ত গুলি ক'রে মারেন। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হ'ল।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে বিপ্লবীদের সন্ধান পেয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে যায়। এতে দুই পক্ষ থেকেই সমানে গুলি চলে। জগদানন্দ মুখুজ্যে, দীনেশ মজুমদার ও নলিনী দাস শেষটায় ধরা পড়েন। দীনেশ মজুমদারের হ'ল ফাঁসি, আর বাকী দু'জনের হ'ল দ্বীপান্তর।

এর পরে কলকাতায় একটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল। এই সম্পর্কে চার জনের হ'ল দ্বীপান্তর, আর ছাব্বিশ জনের

হ'ল দীর্ঘ কারাবাস। টিটাগড়ে ও রংপুরেও পুলিশ বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এ ছাড়াও বহু জায়গায় বহু বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে, চাটগাঁয়ের তো কথাই নেই।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন।

ত্রিশ জন সশস্ত্র সেপাই ও লুইস্ গান সহ একজন হাবিলদার নিয়ে ক্যাপ্‌টেন ক্যামেরন্ ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়ী আক্রমণ করে গভীর রাত্তিরে। গুলি চালিয়ে চালিয়ে ঝাঁঝরা করা হ'ল মাটির দোতলা ঘর। ঘর গেল ভেঙে। ভোরবেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে শুরু ক'রে, জেলার বড় বড় কর্তা ব্যক্তিরা এলেন এবং অতি সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকলেন। দেখা গেল ক্যাপ্‌টেন ক্যামেরনের মৃতদেহ নীচে প'ড়ে আছে। আর প'ড়ে আছে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃতদেহ।

সূর্য সেন ও প্রীতিলতা অন্ধকারেই পুলিশ বেষ্টনী ভেদ ক'রে পালিয়ে গেছেন। সাবিত্রী দেবী, তাঁর কন্যা স্নেহলতা ও ছেলে রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

সূর্য সেনকে গ্রেপ্তারের পুরস্কারের পরিমাণ বেড়ে গেছে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজারে।

এর পরই প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবী দলের মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালী দে ও শান্তি চক্রবর্তী আক্রমণ করে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব। চল্লিশ জন ইউরোপীয় পুরুষ ও নারীকে এক সংগে আক্রমণ করা হয় বোমা আর পিস্তল দিয়ে।

প্রীতিলতার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হ'ল বটে, কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না, আত্মহত্যা করলেন সেইখানেই, দলের বাকী সব ফিরলেন অক্ষত দেহেই।

প্রীতির অদ্ভুত সাহসিকতা, অটুট সংকল্প, অলৌকিক দৃঢ়তা ও আত্মবিসর্জন অনুপ্রাণিত করে চট্টগ্রামের বহু তরুণীকে। কল্পনা দত্ত, কুন্দপ্রভা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে সেই পথেই এগিয়ে যেতে যে পথ রচনা ক'রে গেছেন প্রীতিলতা।

বীরাংগনা প্রীতিলতার পথেই এগিয়ে চললেন কল্পনা দত্ত। তিনিও ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে থাকেন। মাষ্টারদা' তাঁর দায়িত্ব অর্পণ করেন তারকেশ্বর দস্তিদারের ওপর। তারকেশ্বরের নির্দেশে তিনিই হন বিপ্লবী নায়কদের প্রধান কর্মসংগিণী।

এদিকে বন্দী বিপ্লবীদের বিচার হ'ল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাস, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায়, রণধীর দাশগুপ্ত—এই বারো জনের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আর এক বিচারে অম্বিকা চক্রবর্তী ও সরোজ গুহেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

ধলঘাটেরই কাছে গৈরলার গুপ্ত আশ্রয়-কেন্দ্রে সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাশগুপ্ত, মণি দত্ত, ব্রজেন সেন

এক সংগে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী পরিকল্পনায় মন দিয়েছেন। ব্রজেন সেনের বাড়ী থেকে খাবার আসে। দশ হাজার টাকার লোভে ব্রজেন সেনের দাদা নেত্র সেন টের পেয়ে গোপনে খবর পাঠায় পুলিশের কাছে।

ক্যাপ্‌টেন ওয়াম্‌স্‌লী বহু পুলিশ ও পঁয়ত্রিশ জন রাইফেলধারী সেপাই নিয়ে নেত্র সেনের সাহায্যে বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা ঘিরে ফেলে। নেতা সূর্য সেন ধরা পড়েন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী প্রভৃতি অন্ধকারে গা ঢাকা দেন।

পরম বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে বিপ্লবীরা দিয়েছিল তাকে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার।

এবার সূর্য সেনের স্থানে দলের সর্বাধিনায়ক হন তারকেশ্বর দস্তিদার। তিনি এবং কল্পনা দত্ত কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের গুপ্ত আশ্রয়-কেন্দ্র অতর্কিতে একদিন পুলিশ ও মিলিটারী এসে ঘিরে ফেলে। এদের সংগে গুলি বিনিময়ে দু'জন বিপ্লবী নিহত হন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত বন্দী হন।

সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচার একটি প্রহসন মাত্র। বিচার কোর্টে হ'ল না। জেলখানার পাশে গোয়েন্দা অফিসের একটি কক্ষে চুপি চুপি ইংরাজের মামুলি বিচার সমাপ্ত হ'ল। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের হ'ল ফাঁসির হুকুম, আর কল্পনা দত্তের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ইংরাজের ফাঁসির মঞ্চে বহু বাঙালী মুক্তি-সাধক জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। কিন্তু মাষ্টারদা' সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি যেমন ক'রে দেওয়া হয়েছে বর্বরতায় তার তুলনা নেই।

গভীর রাত্রে চোরের মতো চুপি চুপি এসে কারাকক্ষের দরজা খুলে ঘুমন্ত আসামীকে জোর ক'রে টেনে বা'র করা হয় কোথায়? সূর্য সেন ও তারকেশ্বরকে রাত্তিরেই টেনে বা'র করা হ'ল ফাঁসি দেওয়ার জন্য। "ফাঁসীর মঞ্চ পর্য্যন্ত যে সামান্য দূরত্বের পথটি রহিয়াছে, এই পথের ওপরেই শান্ত্রীরা মাষ্টারদা' ও তারকেশ্বরকে নির্মম প্রহার করিয়া চলিয়াছে। মাষ্টারদা' অক্লান্ত ভাবে ধ্বনি দিয়া চলিয়াছেন, 'বন্দে মাতরম্', 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ'। শান্ত্রীদেরও প্রহার চলিয়াছে সংগে সংগে। ঠিক এমনি অবস্থায় মাষ্টারদা' ও তারকেশ্বরকে ফাঁসির মঞ্চে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। একটি মঞ্চে এক সংগে একই সময়ে দুই জনের ফাঁসীর ব্যবস্থা হইয়া আছে। * * * জাগ্রত পাষাণপুরীর প্রতিটি কক্ষে প্রতিধ্বনি উঠিল, 'বন্দে মাতরম্'। দুর্জয় বিপ্লবী কণ্ঠ পাগলের মত হাঁকিয়া চলিল—"বন্দে মাতরম্, মাষ্টারদা' জিন্দাবাদ, ফুটুদা' জিন্দাবাদ।"*

* শ্রীচারুবিকাশ দত্ত-প্রণীত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন"। পৃষ্ঠা ২৮৯

আগষ্ট বিপ্লব

ইংরাজ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও বাংলার বিপ্লবী দলকে ধ্বংস করতে পারে নি। শুধু ১৯৩২ থেকে ৩৫ সালের মধ্যে বিপ্লবী সন্দেহে দু' হাজার সাত শো বাঙালী যুবক অন্তরীণ হয়।

সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য স্থগিত থাকলেও কংগ্রেসের আদর্শ জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করেছে, স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল হ'য়ে জেগেছে তাদের মনে।

কংগ্রেস সকল ভারতবাসীরই। এর মধ্যে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, শিখ নেই, বৌদ্ধ নেই। কিন্তু কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুসলমান সভ্যদের অনেকেই এটাকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান মনে করেন এবং তাঁরা বন্দে মাতরম্ সংগীতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁদের তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস বন্দে মাতরম্ সংগীতের অংগচ্ছেদ করাই স্থির করেন। ফলে অসংখ্য বাঙালী শহীদের বুকের রক্তে রাঙা স্বতঃস্ফূর্ত এই জাতীয় সংগীতের অংগচ্ছেদ করা হ'ল।

মুসলমানরা এ সত্ত্বেও কংগ্রেসের ওপরে প্রসন্ন হ'ল না, মোস্লেম লীগে যোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাই প্রচার করতে লাগল। এর মূলে ছিল ইংরাজের পরামর্শ ও উৎসাহ। এইটিই হ'ল পাকিস্থান সৃষ্টির মূল।

এর পর কংগ্রেসে সত্যিকার গঠনমূলক একটি বিরাট পরি-

কল্পনা উপস্থিত করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজী কংগ্রেসের সমস্ত সংগ্রামেই পুরোভাগে ছিলেন। নির্বাসন আর কারাবরণই তো তাঁর জীবনের ভূষণ! ইউরোপের রাজনীতির প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি করতে হ'লে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশের সর্বত্র বড় বড় কারখানা করতে হবে, শুধু চরকা আর খদ্দরেই হবে না। তিনি রাষ্ট্রপতি হ'য়েই এই জাতীয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেন। এজন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তা'কে ইংরাজীতে বলা হয় National Planning Committe.

"পরিকল্পনা কমিটি"র কার্য সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—(১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও কার্য-ক্ষমতার পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয়, (৪) রাস্তাঘাট ও জিনিষপত্র চলাচলের ব্যবস্থা, (৫) বাণিজ্য ও রাজস্ব, (৬) জনকল্যাণ, (৭) শিক্ষা। সাতাশটি সব-কমিটির ওপর এ সব বিষয়ের কার্যভার ন্যস্ত হয়। জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধেই অনুসন্ধান ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও অধ্যাপক কে. টি. শা পরিকল্পনা কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সভাপতি হন।"*

এই কমিটিতে ডাক্তার মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানী ও

*শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-প্রণীত "মুক্তির সন্ধানে ভারত।" পৃষ্ঠা ৪৮২

সার্ বিশ্বেশ্বরায়ার মতো শিল্প-বিশেষজ্ঞ লোকও ছিলেন। এর পূর্বে গঠনমূলক কাজই ছিল মূখ্যত চরকা আর খদ্দর।

পরের বছর ১৯৩৯ সালে পণ্ডিত জহরলাল, ডাক্তার রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিরোধিতা করেন। সুভাষচন্দ্র বামপন্থী, তাঁর সংগে মহাত্মা গান্ধীর সব বিষয়ে মতের মিল ছিল না। এমন কি, স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নির্বাচনে ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়াকে দাঁড় করান এবং তাঁকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন। এ সত্ত্বেও ভোটাধিক্যে মহাত্মাজীর প্রার্থীকে পরাজিত ক'রে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে মহাত্মাজী লিখেছিলেন—Dr. Pattabhi's defeat is my defeat.—পট্টভীর পরাজয় আমারই পরাজয়।

দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের এ নির্বাচনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হলেন এবং মহাত্মাজীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখবার পরামর্শ করলেন।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস বসল। তার কিছুদিন আগে থেকে সুভাষচন্দ্র ভুগছিলেন প্রবল জ্বরে। এ অবস্থায়ও তিনি কংগ্রেসে গেলেন বিছানায় শুয়ে। দক্ষিণপন্থীরা একটি প্রস্তাব পাশ করলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি শুধু মহাত্মাজীর মনের মত লোক নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবেন। সুভাষচন্দ্র দেখলেন

যে, সভাপতির কোন ক্ষমতা এতে থাকবে না, নির্বাচিত সভাপতিকে শুধু গান্ধীজীর নির্দেশেই চলতে হবে। এদিকে সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হওয়ায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। এর ফলেই সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং সকল বামপন্থীকে একত্র ক'রে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে খুবই জোরালো হ'য়ে ওঠে।

এর পরই শুরু হ'ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভারতবাসীদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-রত দেশ ব'লে ইংরাজ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে কংগ্রেস ইংরাজকে সাহায্য করতে রাজী হন না। ইংরাজের বিরুদ্ধে সারা দেশেই অসন্তোষ দেখা দেয় প্রবল ভাবে।

ইংরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করতে চায় ভারতের টাকা দিয়ে আর ভারতবাসীর রক্ত দিয়ে, কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায় না। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, এই সময়েই ইংরাজকে আঘাত করতে ; কারণ শত্রু যখন বিপন্ন তখনই তাকে আঘাত না করলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয় না।

অবশেষে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। চারদিকে রব উঠল—ইংরাজ, ভারত ছাড়।

কংগ্রেসের বড় ছোট সকল নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হ'ল। কিন্তু জনগণ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে রইল না। তাদের অন্তরের বিদ্বেষ-বহ্নি এবার আত্মপ্রকাশ করল। তাদের শুরু হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন।

এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দমন করতে গিয়ে সরকার চালিয়ে দেন বেপরোয়া অত্যাচার। সহ্য করতে না পেরে জনতা হ'ল উত্তেজিত। এখানে সেখানে তারা উপড়ে ফেললে রেল-লাইন আর টেলিগ্রাফের খুঁটি, কেটে ফেললে তার, জোর ক'রে থানা দখল করে, আক্রমণ করে ডাকঘর, ভেঙে দেয় পুল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় তারা কেটে রাখে রাস্তা যাতে সেপাই নিয়ে যান-বাহন চলাচল না করতে পারে।

এই ভারতব্যাপী বিপ্লব ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় সব চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। বিপ্লব কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রিত নয়। ছোট-বড় সব নেতাই জেলে আবদ্ধ। কংগ্রেসের আদর্শেও এ বিদ্রোহ পরিচালিত হয় নি। অহিংসায় জনগণের বিশ্বাসের পরিচয় বহু জায়গায়ই পাওয়া যায় নি। কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দলের অনেকে আত্মগোপন ক'রে এবং ফরোয়ার্ড ব্লক বা অগ্রগামী দলই প্রধানত এই বিপ্লবের মূল ছিলেন। তা ছাড়া জনগণ এক এক জায়গায় নিজেদের ইচ্ছামতোই কাজ করেছে; নানা জায়গায় গোপনে সংবাদ প্রচার করেছে রেডিও বসিয়ে। কংগ্রেসের আন্দোলন ও

কাজ সবই প্রকাশ্যে করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে করাই কংগ্রেসের নীতি।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশের বুকেও চলল সশস্ত্র পুলিশ ও সেপাইয়ের গুলিবর্ষণ। মেদিনীপুরের জনসাধারণ এমন অবস্থা ঘটিয়েছিল যে, কিছুদিন স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে, ইংরাজ-শাসন হয়েছিল অচল।

মেদিনীপুরে জনগণ দলবদ্ধ হ'য়ে আক্রমণ করে তমলুক থানা। হাজার হাজার লোকের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কাঁপিয়ে দেয় মেদিনীপুরের আকাশ বাতাস। পুলিশের লাঠি চালনায় জনতা হট্‌ল না। এলো মিলিটারি, চলল গুলি। হতাহত হয় অনেকে ; কিন্তু জনতা হটে না। রামচাঁদ বেরা ছিলেন সামনে। পুলিশের গুলিতে তিনি প'ড়ে গেলেন। শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার আগেও তিনি চেঁচিয়ে বললেন—এগিয়ে এসে থানা দখল কর।

তাঁর এই কথায় জনতা গুলির মুখেও এগিয়ে এলো। মাত্র তেরো বছরের ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এগিয়ে এসে একটা সেপাইয়ের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিল। এবার শুরু হ'ল তার ওপর প্রহার। এগিয়ে এলেন ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতংগিনী হাজরা। তাঁর জরাশীর্ণ মুখে মরণজয়ী বিপ্লবীর অপূর্ব দীপ্তি। সেপাইয়ের গুলিতে এই মহীয়সী মহিলার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হ'য়ে গেল। তিনি প'ড়ে গেলেন মাটিতে, কিন্তু হাতে জাতীয় পতাকা ছাড়লেন না কিছুতেই। একটা সেপাই এসে লাথি মেরে

এই পতাকা ফেলে দিল। চলল আবার ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। তেরো বছরের লক্ষ্মীনারায়ণ, চৌদ্দ বছরের পুরীমাধক প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা আত্মাহুতি দিল। জনতা এ-সত্ত্বেও দমল না, সমস্ত রাতই থানা ঘিরে রইল। সকালবেলা জনতা গেল বেড়ে আরো হাজারে হাজারে। বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সহিত তারা দখল করল থানা এবং জ্বালিয়ে দিল দারোগার বাড়ী।

এই আগষ্ট বিপ্লবে মিলিটারির গুলিতে শুধু তমলুকেই নিহত হয়েছিল একচল্লিশ জন ও কাঁথিতে উনচল্লিশ জন। কলকাতা, বালুরঘাট, শিলিগুড়িতেও প্রাণ দেয় সাতাশ জন। শুধু সরকারী মতে খুনের সংখ্যা এই। বহু জায়গার সংবাদ সে সময় সরকার প্রকাশ করে নি। আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর শুধু বাংলারই নয়, সারা ভারতেরই পীঠস্থান। আর বাংলার পল্লীর বৃদ্ধা জননী মাতংগিনী হাজরা বাংলার মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরাংগনা রূপে চির-পূজ্যা হয়ে থাকবেন।* কবির ভাষায় তিনি জেগে ছিলেন "সীমন্তে রক্ত-টীকা" নিয়ে "বহ্নি-শিখা" রূপে।

---

* বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের বিখ্যাত সংগীত :—

"জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা
স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা।
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা।
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী
বিশ্বদাহন তেজে জাগো দাহিকা।"

এই আগষ্ট আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কি না করেছে! লাঠি চলেছে হর্‌দম্ বেপরোয়া ভাবে, চলেছে গুলিবর্ষণ, বহু নারী-ধর্ষণ হয়েছে, বসানো হয়েছে পাইকারি জরিমানা। এসব মামুলি পীড়ন তো সব জায়গায়ই চলেছে; কিন্তু মেদিনীপুরে পীড়নে পুলিশ এমনি অভিনবত্ব দেখিয়েছে যে, জগতে বোধ হয় তার আর তুলনা নেই। দুরন্ত শীতের রাত্তিরে শাস্তি দেবার জন্য মানুষকে পুকুরে ডুবিয়ে রাখার কথা এর পূর্বে জগতে কেউ কোন দিন শুনেছে? মেদিনীপুরে এও সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া শত শত নিরপরাধ লোককে সারাদিন রোদ্দুরে বসিয়ে রেখে মজা দেখেছে পুলিশ।

তমলুক মহকুমায় যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় তার নাম বিদ্যুৎ-বাহিনী। মেয়েদেরও একটি বাহিনী গঠিত হয়েছিল, একে বলা হ'ত ভগিনী-বাহিনী। বিদ্যুৎ-বাহিনী চারদিকে বিপ্লবের ভাবধারা প্রচার করে। জনগণ ত্রিশটি পুল ভেঙে দেয়, কেটে ফেলে সাতাশ মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার, উপড়ে ফেলে একশো চুরানব্বুইটি টেলিগ্রাফ লাইনের থাম, আর পুড়িয়ে দেয় কয়েকটি থানা, অনেকগুলি ডাকঘর ও মদের দোকান।

সরকার আনায় গোরা-সৈন্য। এই সৈন্যেরা হামলা দেয় গ্রামে গ্রামে, জ্বালিয়ে দেয় অসংখ্য বাড়ী, আর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর, শিশুরাও বাদ যায় না।

অসহায় নারীদের ওপর আক্রমণ যে কত হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই। এ সত্ত্বেও ভগিনী-বাহিনী অটল ছিল।

সরকারী অত্যাচারে এক তমলুকেই একশো চব্বিশটি গৃহ ভস্মীভূত হয়। কেরোসিন ও পেট্রোল দিয়ে বহু স্কুল বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ভেঙে চূরমার করা হয় বহু বাড়ী আর লুট করা হয় হাজার হাজার বাড়ী।

কাঁথি মহকুমায় পুড়িয়ে দেওয়া হয় প্রায় এক হাজার বাড়ী, নারীধর্ষণ হয় অসংখ্য, লুট করা হয় প্রায় আড়াই হাজার বাড়ী ; লাঠিতে ঘায়েল হয় প্রায় ৭০০০ লোক, গ্রেপ্তার হয় প্রায় ১৩,০০০ ; এর সংগে গুলিবর্ষণ তো আছেই। আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর সকল রকম অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য ক'রেও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিপ্লবে মেদিনীপুরের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

আজাদী ফৌজের সংগ্রাম

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাপটে সারাটা পৃথিবী থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছে।

একদিন সকালবেলা ভারতের ৪০ কোটি মানুষকে থ' ক'রে দিয়ে খবর বেরুল—নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিখোঁজ।

লোকে কি এমন কথা সহজে বিশ্বাস করতে চায়? সুভাষ ছিলেন জেলে, সেখানে হলেন অসুস্থ, তারপর করলেন প্রায়োপবেশন। জেলখানা থেকে সরকার বাধ্য হ'য়ে তাঁকে এনে বন্দী ক'রে রাখলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। দিনরাত চারদিকে রইল কড়া পুলিশ পাহারা। এ অবস্থায় কলকাতার মতো জায়গা থেকে সমস্ত লোকের চেনা একজন মানুষের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া যে একটা অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপার তাতে সন্দেহের লেশমাত্রও নেই।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। সিংগাপুর যায়-যায়।

ইংরাজ-সৈন্যদের পালাবার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়। জাপানীদের আক্রমণের আগেই ইংরাজ-সৈন্য পলায়ন করে ঝড়ের আগেই শুক্‌নো পাতার মতো। ভারতীয় সৈন্যদের কিছুই জানানো হ'ল না, তাদের ফেলে আসা হ'ল অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর।

সুভাষচন্দ্র বসু

সিংগাপুরে জাপানী আক্রমণ হ'ল, সংগে সংগেই সিংগাপুরের পতনও হ'ল। ভারতীয় সৈন্যরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জাপ-সরকারের প্রতিনিধি এই ভারতীয় সৈন্যদের অর্পণ করলেন জেনারেল মোহন সিংএর হাতে।

এই মোহন সিং প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের এক সমাবেশে বলেন যে, এতদিন পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈন্যবাহিনী তৈরি করবার অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। অতএব এই সশস্ত্র বাহিনীই যুদ্ধ করবে ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য।

এর পর রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশের ভারতীয়দের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সম্মেলন হয় টোকিওতে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সর্বত্রই পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে যান জাপানে এবং স্থায়িভাবে টোকিওতেই বাস করতে থাকেন। কিন্তু বাধ্য হ'য়ে বিদেশে থেকেও ভারতের মুক্তি চিন্তায়ই সমাহিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে স্থির করা হয় যে, কেবলমাত্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনীই ভারতীয়দের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ ক'রে ভারত থেকে শত্রু তাড়াবে।

এর পরেই ব্যাংককে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতি-নিধিদের আর একটি সম্মেলন হয় রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে। কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে গান্ধীজীর ছবি মাঝখানে বসিয়ে এই

সম্মেলন স্থির করে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি-যুদ্ধ শুরু করতে হবে ; ভারতের মুক্তির জন্য ভারতীয় বাহিনী ভারতীয়দের অধিনায়কত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ভারতকে বিভক্ত করা চলবে না।

এই সম্মেলন থেকেই আজাদ্ হিন্দ সংঘ গঠিত হ'ল। সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু। সিংগাপুরে হ'ল এর প্রধান কর্মস্থল। পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেক দেশে এর শাখা স্থাপিত হ'ল।

এই সময়েই ভারতের কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ইংরাজ ছোট-বড় সকল কংগ্রেস নেতাকেই কারারুদ্ধ করল। সারা ভারতে জ্বলে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের বহ্নি।

এদিকে সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে মোটর যোগে আসেন গোমোতে, সেখান থেকে ট্রেণে পেশোয়ার, সেখান থেকে কাবুলীর বেশে পায়ে চ'লে চ'লে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম ক'রে এসে উপস্থিত হন কাবুলে। এখানে এসে আশ্রয় পান উত্তমচাঁদের গৃহে। এখানেও ইংরাজের গুপ্তচর কম ছিল না। যে বাধা, বিপদ ও ভয়ের সম্মুখীন এই সময়ে তিনি হয়েছেন তার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর কাহিনী কল্পনা ক'রেও লিখতে পারেন নি। এক কথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি সব্যসাচীর জীবন্ত রূপ। তিনি কাবুল থেকে গোপনে যান মস্কোতে, সেখান থেকে বার্লিনে। ইটালী ও জার্মানীর হাতে তখন ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীর সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার।

এই ভারতীয় বাহিনীকে তিনি নতুন ক'রে গঠন করেন এবং জার্মান সমর-কৌশলী অধিনায়কদের দিয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলেন। ভারতে ইংরাজ-বিদ্বেষ তখন পুঞ্জীভূত। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতব্যাপী বিপ্লব ইংরাজকে অস্থির ক'রে দিয়েছে। ইউরোপেও তার পরাজয় হচ্ছে। ইংরাজকে এই সময়েই আঘাত হানতে চাইলেন নেতাজী। ভারতের ভেতর থেকে এবং বাইরে থেকে এক সংগে আঘাত করতে পারলেই ইংরাজকে তাড়ানো যাবে, এই বিশ্বাসে এবং এই উদ্দেশ্যেই মুক্তি-পাগল মহাবিপ্লবী নেতাজী দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালের ২০শে জুন হাসান নামে একজন মুসলমান যুবককে নিয়ে ডুবুরী জাহাজে ক'রে সুভাষচন্দ্র এসে উপস্থিত হন জাপানে। চারদিন পরেই টোকিওর রেডিও থেকে তিনি ঘোষণা করেন,—"সারা জীবনই আমি আপোষহীন সংগ্রাম করেছি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপোষহীন ভাবেই সংগ্রাম করব তা যেখানেই থাকি এবং যেখানে থেকেই পারি।"

জাপান থেকে তিনি আসেন সিংগাপুরে। এখানে রাসবিহারী বসু পদত্যাগ করেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রের মতো এত বড় জন-প্রিয় নেতা, পর পর দুইবার ভারতের কংগ্রেসের নির্বাচিত

সভাপতি, অহিংস ও সহিংস সকল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মুক্তি-সাধককে পেয়ে পূর্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী পেলে নূতন প্রেরণা। এই একটি মানুষ তাদের মধ্যে এনে দিলেন মুক্তির উন্মাদনা।

এর পরই নেতাজী নির্বাচিত হলেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি চাইলেন কমপক্ষে তিন লক্ষ সৈন্য আর নয় কোটি টাকা, আর চাইলেন "মৃত্যুভয়হীন বাহিনী"র জন্য একদল মহিলা যাঁদের আদর্শ হবে ঝাঁসির রাণী।

সারা বাংলা তখন পরিণত হচ্ছিল মহাশ্মশানে—পঞ্চাশের মন্বন্তরে। ৫৫ লক্ষ বাঙালী এক মুঠো ভাতের অভাবে, এক ফোঁটা ফ্যানের অভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে। কলকাতার সকল রাস্তায়ই তখন চলমান কংকালের মিছিল। এই মহা দুর্ভিক্ষের সময় আজাদ হিন্দ্ সৈন্যরা কোন বেতন নেন নি। আজাদ হিন্দ্ সংঘ সিংগাপুর থেকে বেতারে ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলার এই চরম বিপদে বার্মার যে কোন বন্দর থেকে তাঁরা এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে প্রস্তুত আছেন, বৃটিশ সরকার যদি দয়া ক'রে বাংলা দেশে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ সরকার এরকম দয়া করেন নি।

এবার গঠিত হ'ল আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র নির্বাচিত হলেন রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র-সচিব। রাসবিহারী বসু হলেন প্রধান উপদেষ্টা, দেবনাথ

দাস অন্যতম উপদেষ্টা। অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পড়ল লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জির ওপর।

আজাদ হিন্দ্‌ সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছিল পূর্ব-এশিয়ার সকল দেশেই। প্রত্যেক শাখাতেই নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ছিল। (১) সৈন্য-সংগ্রহ বিভাগ, (২) সরবরাহ বিভাগ, (৩) অর্থসংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক বিভাগ, (৪) প্রচার বিভাগ, (৫) মহিলা বিভাগ, (৬) সমাজ-কল্যাণ বিভাগ, (৭) সংস্কৃতি এবং জ্ঞানানুশীলন বিভাগ, এবং (৮) রাজনৈতিক বিভাগ।

আজাদ হিন্দ্‌ সংঘ, আজাদ হিন্দ্‌ গভর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ এই তিনটি বহু-শাখা-যুক্ত বিরাট প্রতিষ্ঠানেরই সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তাঁরই নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয় নরনারী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এতে দলে দলে যোগ দেন এবং এর কাজ চলতে থাকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামিনাথনের নেতৃত্বে 'ঝাঁসির রাণী-বাহিনী' গঠিত হ'ল। এই বাহিনী গঠনে নেতাজীর আবেদনে নারী সৈন্যগণ স্বাক্ষর করেছিলেন নিজেদের রক্তে।

সারা এশিয়ার আকাশ বিদীর্ণ ক'রে নেতাজীর কণ্ঠে যে অগ্নিবাণী ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—জয় হিন্দ্‌, তাতে যে শুধু পুরুষেরাই মুক্তির উন্মাদনায় প্রাণ দিতে এগিয়ে এলো তা নয়, নারীরাও এগিয়ে এলেন হাসিমুখে প্রাণ দিতে।

"এই নারী-বাহিনীর যে কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়

তাহা অপূর্ব, তাঁহাদের কর্মনিষ্ঠা অতুলনীয়। এই সম্পর্কে কুমারী বেলা দত্তের যে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় এই নারী-বাহিনীর সৈনিকগণ নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মনিয়োজিত করিয়াছিলেন। কুমারী বেলা দত্তের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এই মেয়েটি অতুলনীয় সাহসের সংগে শত্রু-বিমানের অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণের মধ্যেও স্থিরভাবে তাহার কর্তব্য করিয়া গিয়াছিল। দিনের পর দিন, রাত্রিব পর রাত্রি প্রচণ্ড মৃত্যু ও ঝঞ্ঝার মধ্যে শান্ত সমাহিত চিত্তে নিজের কার্য করিয়া যায়। তাহার নিকট মৃত্যু ছিল নিছক উপহাসের বস্তু। কর্মই ছিল তার জীবনের একমাত্র আদর্শ।* একবার আজাদ হিন্দ্ সৈন্যগণের মধ্যে মারাত্মক ভাবে আমাশয় দেখা দেয়। সেই সময় শ্রীমতী বেলা একলা ৮৫ জন আমাশয় রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করে। এই সময় এই ছোট মেয়েটি মাতার ন্যায় স্নেহ, ভগিনীর ন্যায় ভালবাসা লইয়া অক্লান্ত হস্তে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া এই অসুস্থ সৈনিক-গণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। একবার শ্রীমতী বেলা

---

* "With a soul-stirring speech he (Netaji) raised the morale of the soldiers sky-high. Our Regiment was also there. If Netaji had asked me to cut my throat for my country, I could have done it on the spot."

'Jai Hind'—The Diary of a rebel daughter of India with the Rani of Jhansi Regiment.—P. 70.

বোমার ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছিল। ভাগ্যক্রমে এই যাত্রা শ্রীমতী বেলার সহকর্মিগণ তাহাকে উদ্ধার করে।

"নেতাজী যেমন ঝাঁসির রাণী-বাহিনী গঠন করেন, তেমনি বালক-বালিকাদের লইয়া এক বালসেনাদল গঠন করেন। এই দল আত্মঘাতী সেনাদল হিসাবে কার্য করিত। মৃত্যুর মহোৎসবে তাহারাও চরম ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ব্রহ্মের যুদ্ধে যে অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের পরিচয় দেয়, তাহা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। তাহাদের প্রধান কার্য ছিল শত্রুর ট্যাংক্ ধ্বংস করা। তাহারা নিজেদের পীঠে মাইন বাঁধিয়া শত্রুর ট্যাংকের অপেক্ষা করিত। শত্রুর ট্যাংক্ উপস্থিত হইলে তাহার তলায় শুইয়া পড়িত। ট্যাংক্গুলি ধ্বংসের সংগে সংগে তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস ব্রহ্মদেশের বাতাসে মিশিয়া যাইত।"*

নেতাজীর আহ্বানে প্রবাসী ভারতবাসীরা সর্বস্ব পণ করেছিল। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই শুধু বার্মার ভারতীয়গণ আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে দিয়াছিল আট কোটি টাকা। ১৯৪৫ সালের নববর্ষের উপহার হিসাবে মালয় দিয়েছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা। আজাদ হিন্দ্ ব্যাংক করবার জন্য একজন মুসলমান একাই দিয়েছিলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। নেতাজী যে ভারত-

* শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী-প্রণীত "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ—প্রথম খণ্ড"। পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

বাসীর কত প্রিয়, তার ধারণা কিছু করা যায় তাঁর গলার মালা কিনে নেবার প্রতিযোগিতায়। নেতাজীর গলার মালা একজন পাঞ্জাবী যুবক বারো লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিজের বুকে চেপে ধরেছিল। হাবিব নামে একজন প্রবাসী ভারতীয় মুসলমান আজাদ হিন্দ্ সংঘে দান করেন এক কোটি টাকা।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের হাতে এলে নেতাজী আন্দামানের নাম দেন 'শহীদ দ্বীপপুঞ্জ', আর নিকোবরের নাম রাখেন 'স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।'

নেতাজী যেমন ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদের শত্রু ছিলেন, তেমনি জাপ-সাম্রাজ্যবাদেরও শত্রু। তাঁর কার্যকলাপে ইংরাজ তো তাঁকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছেই, জাপ-সরকারও হ'ল বিষম রুষ্ট। দুই পক্ষ থেকেই নেতাজীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়। একবার একজন রিভলভার সহ ধরা প'ড়ে যায়। সে স্বীকার করে যে, নেতাজীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই সে এসেছিল। আরো অনেকে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টায় আছে।

কয়েকদিন পরেই খুব অন্ধকার রাত্রে একদিন মোটরে ক'রে রাসবিহারী বসুর মতো একজন লোক আসে। নেতাজীর রক্ষী-দলের নেতা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম?"

"আমার নাম রাসবিহারী বসু। নেতাজীর সংগে নির্জনে একটু পরামর্শ করতে চাই।"

খবর শুনে নেতাজী বললেন, "রাসবিহারী বসু তো এখন

চৌকিওতে। তিনি এখন এখানে এলেন কি ক'রে? যাই হোক, ভদ্রলোককে নিয়ে এস।"

রক্ষীরা নীচে এসে দেখলে যে, নকল রাসবিহারী বসু মোটরে ক'রে পালাচ্ছেন। তাকে আর ধরতে পারা গেল না। এর পর মিংলাডন নামে জায়গায় একবার এবং শান রাজ্যের রাজধানী টাংগিতে আর একবার নেতাজীকে হত্যা করবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু দৈবক্রমে এই দু'বারও তিনি রক্ষা পান।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে জাপান তাঁবেদার ক'রে নেওয়ার চেষ্টায় বিফল হ'ল শুধু নেতাজীর জন্যই। এই বাহিনীই ব্রহ্মকে করেছিল স্বাধীন। নেতাজীর নির্ভীক স্বাদেশিকতা জাপানের বিশেষ আতংকের কারণ হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভিযান-বাহিনীর এক একটা ভাগের এক একটা বিশেষ নাম ছিল ঃ

১। মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজের নেতৃত্বে 'সুভাষ ব্রিগেড্'।

২। কর্ণেল ইনায়াৎ কিয়ানির নেতৃত্বে 'গান্ধী ব্রিগেড্'।

৩। কর্ণেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে 'আজাদ ব্রিগেড্'।

৪। কর্ণেল গুরু বক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে 'নেহেরু ব্রিগেড্।'

৫। কর্ণেল লক্ষ্মীর নেতৃত্বে 'ঝাঁসির রাণী ব্রিগেড্'।

এই কয়েকটি ব্রিগ্রেড্ বা বাহিনীই ছিল প্রধান। এদের

সংগে আরো বিভিন্ন রকমের বাহিনী ছিল বিভিন্ন রকমের কাজ করবার জন্য।

তেরোটি স্বাধীন দেশ আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকার করে। এই সরকারের রেডিও-ষ্টেশন বসে এবং এ থেকে প্রচার-কার্য চলে খুব দক্ষতার সহিত। তিনখানা দৈনিক ও একখানি সাপ্তাহিক পত্র চলতে থাকে। মোট কথা, যে কোন উন্নত স্বাধীন রাষ্ট্রের মতোই এঁদেরও সমস্ত বিভাগের সকল কাজই চলতে থাকে।

এর পর শুরু হ'ল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভিযান। প্রধান কর্মস্থল হ'ল এবার বর্মা। বর্মা তখন বৃটিশ কবল-মুক্ত। নেতাজী ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "আমাদের হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা যেন অটুট থাকে—হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু। আমাদের একমাত্র পথ দিল্লীর পথ। দিল্লীর পথই মুক্তির পথ। স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ। চল দিল্লী।"

এদিকে ইংরাজ মিথ্যা প্রচার শুরু ক'রে দিয়েছে—আজাদ হিন্দ্ সংঘ জাপানের তাঁবেদার, ওদিকে জাপান সম্পূর্ণ বিরূপ, কারণ আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারলে না নেতাজীর অনমনীয় দৃঢ়তায়।

কোহিমা ও ইম্ফল রণাংগনে পৌঁছাবার পূর্বে ভারতীয় সৈনিকদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে মেজর জেনারেল শা নওয়াজের নেতৃত্বে প্যালেলী নামক স্থানে ইংরাজের

সংগে যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে প্যালেল বিমানঘাঁটি ভারতীয় বাহিনী অধিকার করে। ইংরাজ-সৈন্য সেখান থেকে বিতাড়িত হয়।

ঝাঁসি বাহিনীও একটি বৃটিশ সৈন্য বাহিনীকে প্রথমে গুলি চালিয়ে, পরে বেয়নেট চার্জ ক'রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। ঝাঁসি বাহিনীর এই জয়ই মোরাই, কোহিমা প্রভৃতির পথ শত্রু-মুক্ত করে দেয়। ঝাঁসি বাহিনীর এই অপূর্ব কৃতিত্ব ভারতের মুক্তির ইতিহাস চিরউজ্জ্বল ক'রে রাখবে।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যখন যুদ্ধে লিপ্ত, তখন নেতাজী নিজে রণাংগনে উপস্থিত থাকতেন যুদ্ধের পোষাকে, সাধারণ সৈনিকের সংগে একই খাদ্য খেতেন। তাঁর জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। তা ছাড়া তিনি সারা দিন-রাত্তিরে বিশ্রাম করার সময় পেতেন মাত্র দুই ঘণ্টা। বহুদিন ধ'রে তিনি ঘুমুতেন এই দুটি ঘণ্টা মাত্র। তাঁরই একটা কথায় যে হাজার হাজার মানুষ অনায়াসে প্রাণ দিতে এগিয়ে যেত এবং তাঁকে যে সব চেয়ে বেশি ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত তার প্রধান কারণ এই যে, তিনি সকলকেই ভালবাসতেন সমস্ত মন দিয়ে, আচারে আচরণে নিজেকে কখনো স্বতন্ত্র করেন নি। একদিন এক সামরিক হাসপাতালে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, একজন সাধারণ সৈনিকের গায়ে কোট নেই। তিনি নিজের গায়ের কোট খুলে সৈনিককে দিয়ে এলেন।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী যাতে প্রবলভাবে লিপ্ত হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আজাদ হিন্দ্ সরকার একটি সমর-পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদে ছিলেন—

১। কর্ণেল জে. কে. ভোঁসলে
২। „ এম্. জেড. কিয়ানি
৩। লেঃ কর্ণেল এহসান কাদির
৪। ” ” আজিজ্ আহমদ খাঁ
৫। ” ” হবিবুর রহমান
৬। ” ” গুলজারা সিং
৭। শ্রী এন্. রাঘবন
৮। শ্রী এস্. এ. আয়ার
৯। শ্রী পরমানন্দ
১০। কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জি, সেক্রেটারি
১১। শ্রী এ. ইয়েলাপ্পা, সংযুক্ত সদস্য

যুদ্ধের অভিযান ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান রণ-ক্ষেত্রে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করেছে, টিড্ডম অঞ্চলে এগিয়ে গেছে, কালাদান যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে নির্মূল ক'রে এগিয়েছে, আর এগিয়েছে প্যালেল ও কোহিমার যুদ্ধেও। শত্রুর সৈন্য-সংখ্যা ও যুদ্ধবল ঢের বেশি থাকা সত্ত্বেও তারা এদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে হাকা অঞ্চলে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিমান-বাহিনী ছিল না। তাদের এই যুদ্ধ ভারতেরই মুক্তি-যুদ্ধ, জাপানের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ নয় বুঝতে পেরে জাপান বিমান দিয়ে এঁদের সাহায্য তো করেই নি, ক্রমাগত অন্তরায়ই সৃষ্টি করেছিল। অবিশ্যি নেতাজীর চেষ্টায়ই জাপান বোমা বর্ষণ ক'রে ভারতের নগর-গুলি ধ্বংস করেনি।

"১৬ই মার্চ ১৯৪৫ সাদী অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের গোলা-গুলি ও বোমা বর্ষণের মধ্যে মাত্র ৯৮ জন আজাদ হিন্দ্ সৈন্য চরম আত্মাহুতির সংকল্প লইয়া হাতাহাতি সংগ্রাম করিয়া যে বীরত্বের পরিচয় দেয় তাহা ইতিহাসে অপূর্ব। থার্মো-পলির ও হলদিঘাটের যুদ্ধের পর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। আজাদী সৈন্যগণ নেতাজীর জয়ধ্বনি করিয়া দুই ঘণ্টা হাতাহাতি সংগ্রামের পর বৃটিশ সৈন্যগণ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অপেক্ষা অধিক অস্ত্র-শস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। এই সব দিল্লী অভিযাত্রী মুক্তি সৈনিকগণের চল্লিশ জন, সমসংখ্যক অপেক্ষা অধিক বৃটিশ সৈন্য হতাহত করিয়া শেষ শয্যা গ্রহণ করিল।"*

মণিপুর ভারতবর্ষেরই পূর্ব প্রান্ত। অসীম বীরত্বের সহিত অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যখন

* শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী-প্রণীত "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রথম খণ্ড"। পৃষ্ঠা ১০৮

মণিপুরে প্রবেশ করে তখন মাতৃভূমির মাটির স্নেহস্পর্শে হ'য়ে পড়ে অভিভূত। তারা এই ভারতের মাটিকে সাষ্টাংগে প্রণাম ক'রে চুম্বন করে, তারপর এই মাটিই হাতে তুলে প্রতিজ্ঞা করে—যতদিন দেহে শেষ রক্তবিন্দুও থাকবে ততদিনই বন্দিনী মায়ের শৃংখল মোচনের সংগ্রামে তারা নিবৃত্ত হবে না।

একদিকে জাপানের চক্রান্তে আজাদী বাহিনীর খাদ্যাভাব, পোষাকের অভাব, অস্ত্রের অভাব, আর একদিকে শত্রু-পক্ষের বিশাল বোমারু-বাহিনীর অবিশ্রান্ত প্রবল বোমা-বর্ষণের মধ্যেও মুক্তি সৈনিকেরা রইল অটল। কিন্তু অবিরাম বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে। দিনের পর দিন চলে প্রবল বৃষ্টি। সব জায়গায়, সব পথে কাদা আর জল। চলবার উপায় নেই, উপায় নেই দাঁড়াবার। এর ওপরে শত্রুর বিমান-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ। ইম্ফল রণাংগন ও কোহিমা থেকে পেছিয়ে আসতে হ'ল আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নেতাজীর নির্দেশে। নেতাজী বললেন,—"আমি পরাজয় স্বীকার করি না, মুক্তি-সংগ্রামের এই তো মোটে শুরু, আরো বহু বহু সংগ্রাম করতে হবে, তবে আমাদের মুক্তি।"

জেনারেল শা নওয়াজ, ধীলন ও সেহগল বন্দী হলেন।

এদিকে য়্যাটম্ বোমা দ্বারা আমেরিকা হত্যা করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নর-নারী ও শিশু জাপানের দুটি শহরে। জাপান বাধ্য হ'ল আত্মসমর্পণ করতে। নেতাজী বিমানে যাত্রা করলেন

টোকিওতে। পথে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি ভয়ানক ভাবে আহত হলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল হাসপাতালে। সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন ব'লে সারা জগতে খবর বেরুল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাড়ে উনিশ হাজার সৈন্য বন্দী হ'ল ইংরাজের হাতে। এদিকে শা নওয়াজ, ধীলন ও সেহগলের বিচার শুরু হ'ল লাল কেল্লায়। কোটি কোটি মানুষের জয় হিন্দ ধ্বনিতে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠল। নেতাজীর সহকর্মী মুক্তি-যুদ্ধের এই বীর সেনানায়কদের মুক্তির দাবী জানালে সারা ভারত। কলকাতায় মিছিল বেরুল এর প্রতিবাদে। পুলিশ চালাল গুলি এই নিরস্ত্র জনতার ওপর। রামেশ্বর বাঁড়ুজ্জে, দেবব্রত বিশ্বাস প্রভৃতি ছাত্র নিহত হলেন এই গুলিতে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবী এতে আরো প্রবল হ'ল। শেষটায় শা নওয়াজ, ধীলন ও সেহগল মুক্তি পেলেন।

আজাদ হিন্দ্ সংঘের ও ফৌজের 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি সারা ভারতে প্রচলিত হ'ল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু থেকে নিতান্ত নগণ্য ভারতবাসীরও মুখে মুখে।

বিগত দু'শো বছর ধ'রে শাসকরা আমাদের নিরস্ত্র ক'রে রেখেছে, আমাদের জাতি অস্ত্র চালাতে ভয় পায়। আমরা ভাবি স্বাধীনতার জন্য আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে পারি না। সুভাষ আমাদের কাছে, সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, এই দুর্বলতা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আমাদের জাতের ব্যবসাদার,

কেরাণী, এমন কি মেয়েরাও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারে। তিনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করেছেন, সমাধান করেছেন খাদ্য-সমস্যা, ভাষা-সমস্যা। কী তিনি সমাধান করেননি? পূর্ব-এশিয়ায় তাঁর কার্যাবলী আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর অভিনব আদর্শ। আজাদ সরকারের পূর্ব-এশিয়ার কার্যাবলী আমাদের শিখেয়েছে অনেক কিছু, খুলে দিয়েছে আমাদের চোখ। আমরা আজ অনুভব করি আগের চেয়ে আমরা সবলতর, স্বাধীনতার যোগ্য আগের চেয়েও ঢের বেশি। আমাদের দেশ তাঁর কাছে খুবই ঋণী। তিনি ভারতে যা করেছেন, সে জন্য আমরা তাঁর কাছে খুবই ঋণী; কিন্তু পূর্ব-এশিয়ায় তিনি যা করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে আমরা আরো—আরো বেশি ঋণী।*

---

* Introduction to "Jai Hind"—The Diary of a rebel daughter of India with the Rani of Jhansi Regiment.

—শেষ—